ভৌত বাস্তবতা ঃ আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ

অজয় রায়

আইনস্টাইনের সাথে রবীন্দ্রনাথের মোট চারবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। ১৯৩০ সালেই দু'বার সাক্ষাৎ ঘটে এক মাসের মধ্যেই । ১৯৩০ সালে প্রথমটি ঘটে, ১৪ ই জুলাই তারিখে জার্মানী পরিভ্রমণ কালে। দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ ঘটে এর ২৫ দিন পর একই স্থানে ১৯ শে আগস্ট তারিখে, একই বছর। অন্য দুটি সাক্ষাৎ সম্স্লর্কে কোন বিশেষ তথ্য পাওয়া যা না- সে সময় তাঁরা কী নিয়ে কথাবার্তা বলেছিলেন তা আজ আর জানবার উপায় নেই। তবে এটি নিশ্চিত যে এই সাক্ষাৎকার উভয়ের প্রতি উভয়ের গভীর শ্রদ্ধাবোধের জন্ম দিয়েছিল- এই দুই বিশাল ব্যক্তিত্ব পরস্স্লরকে প্রভাবিত করেছিল, পরস্স্লরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। কবির সাথে পর আইনস্টাইনের পরিচয় হওয়ার অব্যবহিত পরেই তিনি কবিকে লিখেছিলেন (১) :

> জার্মানীতে যদি এমন কিছু থাকে যা আমি আপনার জন্য করতে পারি, তবে যখন ইচ্ছে হয় দয়া করে আমাকে আদেশ করবেন।

উল্লিখিত এই দু'বারের সাক্ষাৎকালেই তাঁরা নানা বিষয়ে নিবিড় আলাপচারিতায় মগ্ন হয়েছিলেন। আলোচনায় স্থান পায় নি হেন বিষয় ছিল না- তৎকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি, জার্মানী, ইউরোপীয় ও ভারতীয় রাজনীতি, সমাজ সংস্কৃতি, ইহুদি ও প্যালেস্টিনীয় সমস্যা ...। প্রথম সাক্ষাতে তাঁদের মুখ্য আলোচনা আবর্তিত হয়েছিল বিশ্ব প্রকৃতির স্বরূপ ও ভৌত বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে। আশ্চর্য হতে হয় কবি এত বিজ্ঞান জানলেন কি করে, আর বিজ্ঞানী এত কাব্যিক হলেন কি করে ? আর দ্বিতীয় বারের আলাপচারিতা আবর্তিত হয়েছিল ইউরোপীয় ও ভারতীয় সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে কেন্দ্র করে।

আমরা এই নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব প্রকৃতির স্বরূপ ও ভৌত বাস্তবতা সম্স্লর্কে তাঁর ধারণার পাশাপাশি বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের ভৌত বাস্তবতার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

ভৌত বাস্তবতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাথে আইনস্টাইনের আলাপ প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে ভৌত বাস্তবতা কী, বিশেষ করে পদার্থবিদদ্যার দৃষ্টিতে, তা নিয়ে এবং এ সম্স্লর্কে আইনস্টাইনের ধারণা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ভৌত বাস্তবতার প্রকৃতি

প্রথমতঃ বাস্তবতা অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলি 'রিয়ালিটি'র (reality) এর অর্থ কি? আমাদের সাধারণ মানুষের কাছে ভৌত বাস্তবতা হল আমাদের চার পাশে আমরা যা 'দেখি' - আশে পাশের মানুষ ও জীবজগৎ, বস্তুনিচয়, মহাবিশ্বের গ্রহ তারা শশী, নক্ষত্রপুঞ্জ, নীহারিকা ... এ সবই ভৌত বাস্তবতার প্রকাশ। এক কথায় আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষণ করি তাকেই আমরা বলে থাকি ভৌত বাস্তবতা অর্থাৎ যে কোন কোন সত্তার পার্থিব অস্তিত্বই (material or physical existence) হল ভৌত বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে

আমরা ধরতে পারি, ছুতে পারি, দেখতে পারি, অনুভব করতে পারি আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। এই বাস্তবতার ধারণা সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা প্রসুত। যে কোন ভৌত বাস্তবতা প্রকাশ পায় তৎ সংশ্লিষ্ট কতিপয় ধর্মাবলীর মাধ্যমে, -এদেরকে বলা যেতে পারে ভৌত রাশি (physical reality)। এসব পর্যবেক্ষণ যোগ্য ভৌত রাশিসমুহকে বলা হয় ঐ ভৌত বাস্তবতার উপাদান।

এই অনুভব বা প্রত্যক্ষণের সাথে বাস্তবতার একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ইলেকট্রণ আছে বলেই এটি মনুষ্য নির্মিত যন্ত্রে ধরা দেয়, না থাকলে এটির রূপ ধরা পড়ত না। বাস্তবতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল সকল মানুষের কাছে, একই পার্থিব অবস্থার অধীনে, সমরূপে দেখা দেবে। মেঘ প্রকোষ্ঠে একটি প্রোটনের পথচিহ্ন পৃথিবীর সকল গবেষণাগারেই ধরা পড়বে যদি একই অবস্থা ও শর্তাধীনে পরীক্ষণটি সম্পাদিত হয়। অধিবিদ্যাবাদীরা অবশ্য বলবেন আমাদের কাছে 'দৃশ্যমান' ইলেকট্রন বা প্রোটনটির কিন্তু 'প্রকৃত রূপ' তা নয়। এটি আমাদের মনোজাগতিক নির্মাণ। পদার্থবিদ অধিবিদ্যার এই সুক্ষ্ম প্রশ্নের মুখোমুখী হতে চায় না। অধিবিদ্যাবাদীরা মনে করেন 'পরম বাস্তবতা' হল আমাদের কাছে যে সত্তাটি প্রত্যক্ষ্যমান হচ্ছে তা পর্যবেক্ষমান অবস্থার পরিবর্তনে ভিন্ন জনের কাছে আপাত ভিন্নরূপে দেখা দিলেও এই বাস্তবতার পশ্চাতে একটি সত্তা রয়েছে পর্যবেক্ষমান শর্ত অনপেক্ষ। এই বাস্তবতাকে বলা যেতে পারে 'পরম সত্তা' বা অ্যাবসলিউট রিয়ালিটি (absolute reality)। পদার্থবিদ্যা এ ধরণের বাস্তবতা নিয়ে নিরর্থক মাথা ঘামায় না।

আর এক ধরণের বাস্তবতার আমরা অনুভব করি– ভালবাসা- -মমতা-রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি; এসব আনুভুতি শারীরবৈদ্যিক ও মানস-মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ার সৃষ্টি যা আমাদের মনোজাগতিক নির্মাণ।

আর এক ধরণের বাস্তবতা নিয়ে দার্শনিক, শারীরবিদ্যাবিশারদ এবং মনোবিজ্ঞানীরা নাড়াচারা করেন যার অস্তিত্ব কেবল মনোজগতেই থাকে এবং মস্তিষ্কের জটিল ক্রিয়া থেকে উদ্ভুত।, হাসি-কান্না প্রেম-ভালবাসা, দুঃখ-বেদনা, ক্রোধ-হিংসা, সৌন্দর্য ইত্যাকার বোধ এ ধরণের বাস্তবতার উদাহরণ। এ ধরণের বাস্তবতা যতই বাস্তব বলে মনে হোক এরা ভৌত বাস্তবতার অধীন নয়, সুতরাং আমাদের আলোচনায় তা আসবে না।

এম্পিরিসিজম (empiricism) বলতে আমরা বুঝব আমাদের অভিজ্ঞতা (experience) প্রসুত জ্ঞান বা ধারণা যাকে দর্শনের ভাষায় বলা হয়ে থাকে 'অভিজ্ঞতাবাদ'। অভিজ্ঞতাবাদ থেকে উপনীত সিদ্ধান্ত বা কোন ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মুল ভিত্তি হল পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ। এই ধরণের পদ্ধতির আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা এভাবে দেয়া যায় যে 'তত্ত্ব কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের উৎস থেকে গড়ে ওঠে অর্থাৎ মনুষ্য অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণ নির্ভর, এর পেছনে কোন তত্ত্বজ্ঞান নেই'। পর্যবেক্ষণ লব্ধ পুঞ্জীভুত উপাত্তমালা বিশ্লেষণ করে 'আরোহনে'র (induction) পদ্ধতিতে একটি সার্বজনীন জ্ঞানের স্তরে বা সুত্রে উপনীত হওয়ার পদ্ধতিকেই আমরা বলে থাকি অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি (empirical method)। এই পদ্ধতিতে কোন পুর্ব ধারণা প্রসুত জ্ঞানের (a priori knowledge) অস্তিত্বের কথা স্বীকার করা হয় না। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের অনেক প্রতিভাসের ব্যখ্যা দেওয়া হয়েছে 'অভিজ্ঞতাবাদের' পথ অনুসরণ করে। একটি উদাহরণ দেয়া যাক– উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে দেখা গেল যে পরমাণু নিঃসৃত বর্ণালীর তরঙ্গদৈর্ঘ্যসমুহকে কতিপয় সুনির্দ্দিষ্ট বর্ণালী অনুক্রমের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন ১৮৮৫ সালে জে. জে. বামার হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে নির্গত

বর্নালীর (দৃশ্যমান সীমায়) একটি অনুক্রম আবিষ্কার করেছিলেন যার গাণিতিক সুত্র তিনি নিম্নভাবে প্রকাশ করেছিলেন ঃ

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right) \qquad n = 3,4,5 \ldots\ldots \alpha$$

এখানে জ হল একটি ধ্রুবক যা এখন রিডবার্গ ধ্রুবক নামে পরিচিত, আর এর মান হল $R = 1.097 \times 10^{-3} A^{-1}$। বর্তমানে এটি বামাত্ম অনুক্রম নামে পরিচিত। এর পরপরই হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে নির্গত বর্ণালীতে আরও কয়েকটি অনুক্রম আবিস্কৃত হয়। শুধু হাইড্রোজেন নিঃসৃত বর্ণালীতে নয়, অন্য পরমাণু নিঃসৃত বর্ণলীতেও এ ধরণের অনুক্রম লক্ষিত হয়। রিডবার্গ বিভিন্ন পরমাণু থেকে প্রাপ্ত বর্ণালী বিশ্লেষণ করে বর্ণালী অনুক্রমের একটি সাধারণ সুত্র উদ্ভাবন করেছিলেন ১৮৮৯ সালে। এই সাধারণ সুত্রটি হল ঃ

$$\frac{1}{\lambda} = \bar{\nu} = R\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right) \qquad (n > m)$$

এখানে স হল একটি স্থির অখণ্ড সংখ্য ($m = 1,2,3, \ldots$) এবং স এর এক একটি মান এক একটি অনুক্রম স্থির করে, অন্যদিকে হ হল পরিবর্ত্য অখণ্ড সংখ্যা ($n = 2,3, \ldots$) যা বর্ণালীর একটি অনুক্রমের অভ্যন্তরে এক একটি 'তরঙ্গ সংখ্যা' নির্ধারণ করে। উপর্যুক্ত সমীকরণটিকে বলা হয় রিডবার্গের প্রায়োগিক সুত্র। পরবর্তীকালে পদার্থবিজ্ঞানী নীলস বোর তাত্ত্বিকভাবে এই সুত্রের আহরণ করেছিলেন ১৯১২ সালে পারমাণবিক মডেল প্রস্তাব করে যা পরমাণু নিঃসৃত বিকিরণের ব্যাখ্যা দান করতে সমর্থ হয় এবং রিডবার্গের সুত্র স্বতঃভাবেই বেরিয়ে আসে এবং বোর মডেল তত্ত্বীয়ভাবে রিডবার্গ ধ্রুবকের যে মান নির্ধারণ করলেন তা পুর্ব পরীক্ষিত মানের সাথে অবিশ্বাস্যভাবে মিলে গেল। বোর তত্ত্বের সার কথা হল পরমাণুর ধনাত্মক নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনসমুহ বিভিন্ন বিকিরণহীন বিশেষ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। এই ইলেকট্রন সজ্জা বিশেষ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যেমন প্রথম কক্ষে দুটি ইলেকট্রন, পরবর্তী কক্ষে আটটি ইলেকট্রন পরিভ্রমন করে, পরেরটিতে আঠারটি .. ..। সাধারণ নিয়ম হল কোন বিশেষ কক্ষে ইলেকট্রন সংখ্যা, $Q = 2n^2$, এখানে হ হল কক্ষের ক্রমিক সংখ্যা। নিউক্লিয়াসের নিকটতম কক্ষের এই ক্রমিক সংখ্যা হল $n = 1$, পরের কক্ষটির নম্বর হল 2 ...; হ'কে বলা হয় কক্ষীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা। দ্বিতীয়তঃ কোন ইলেকট্রনকে স্বাভাবিক স্তর পরবর্তী উচ্চতর শক্তিস্তরে উন্নীত করতে হলে এই শক্তিস্তর দুটির পার্থক্যের পারিমান রশ্মি শক্তি দ্বারা পরমাণুটিকে উদ্ভাসিত করলে পরমাণুটি এই পরিমান শক্তি অবশোষণ করে ইলেকট্রনটিকে উচ্চতর স্তরে উঠিয়ে দেয়। ইলেকট্রনটি উত্তেজিত স্তরে নির্দ্দিষ্ট 'জীবন কাল' শেষে স্বাভাবিক স্তরে প্রত্যাবর্তন করে, এড়্গাং প্রত্যাবর্তন মুহুর্তে রশ্মি বিকিরণ আকারে বেরিয়ে আসে যার শক্তির পরিমান শক্তি-স্তর দুটির অন্তরের সমান। এই হল বোর তত্ত্ব অনুযায়ী পরমাণু নিঃসৃত বিকিরণের গুঢ় রহস্য। আর একটি উদাহরণ দেয়া যাক।

আমরা জানি নিউটনের আবির্ভাবের অনেক আগে, টাইকো ব্রাহের সৌরজাগতিক গ্রহ-উপগ্রহাদির ওপর প্রায় নিঁখুত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে যোহানেস কেপলার (১৫৭১-১৬৩০) সুর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণরত গ্রহাদির কক্ষপথ ও গতি সম্পর্কে তিনটি নিয়মের ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন। পাঠকের কৌতুহল চরিতার্থে এ তিনটি নিয়ম উল্লিখিত হল ঃ

১। সূর্যকে একটি ফোকাস বিন্দুতে রেখে গ্রহসকল উপবৃত্ত পথে সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করে (কক্ষপথের নিয়ম)।

২। একই কাল ব্যবধানে গ্রহের যে কোন অবস্থানে সূর্য থেকে গ্রহ পর্যন্ত সংযোজী সরল রেখা একই পরিমাণ ক্ষেত্রফল রচনা করে (ক্ষেত্রফলের নিয়ম)।

৩। সূর্যের চারদিকে গ্রহসকলের আবর্তন কালের বর্গ সূর্য থেকে গ্রহদের গড় দূরত্বের ঘনফলের সমানুপাতিক (আবর্তন কালের নিয়ম)।

এই নিয়ম তিনটিকে বর্তমানে কেপলারের নিয়ম বলা হয়ে থাকে, যা তিনি ১৬০৯ থেকে ১৬১৯ সালের মধ্যে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) সর্ব প্রথম মহাকর্ষণের ব্যস্তবর্গীয় নিয়মের ভিত্তিতে সনাতনী বলবিজ্ঞানের নিয়ম প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ তত্ত্বীয় ভিত্তিতে কেপলারের নিয়ম তিনটিকে নির্ধারণ করেন (১৬৮৭)। অসীম দূরত্বাবধি ক্রিয়াশীল এই মহকর্ষণ নিয়মই মহাবিশ্বকে নতুন ভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরেছে।

একথা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে 'বাস্তবতার' অবশ্য বস্তুতান্ত্রিক গুণ (objective quality) থাকতে হবে, যাকে বলা হয় 'বস্তুগত বা বিষয়মুখী বাস্তবতা'। বিষয়মুখিতা বলতে আমরা কী বুঝি? আমাদের মন বা অনুভূতির বাইরে স্বাধীনভাবে কোন বস্তু বা সত্তার অস্তিত্বের ধারণাকে সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে বস্তুতন্ত্রতা বা 'বিষয়মুখিতা'। আরও সরল করে বলতে হলে বলা যায় 'বস্তুর অস্তিত্ব আছে' এই বিশ্বাসের নামই হল 'বিষয়মুখিতা'। যে দার্শনিক মতবাদ 'বস্তুগত বাস্তবতার' ওপর গুরুত্ব দেয় তাকে সাধারণভাবে বলা হয় 'বিষয়মুখিতা' বা 'বস্তুতন্ত্রবাদ'। ইংরেজীতে এই মতবাদ 'objectivity or objectivism' নামে আখ্যায়িত। আমাদের সাধারণ জীবন বস্তুগত বাস্তবতাকে নিয়েই গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের কাজও এই বস্তুগত জগৎ নিয়ে যার অস্তিত্বে সে বিশ্বাসী। আমাদের সভ্যতা ও অধুনিক কৃৎকৌশল গড়ে উঠেছে বস্তুগত বাস্তবতা ও প্রকৃতির নিয়মসমূহের ভিত্তিতে। সুতরাং ভৌত বাস্তবতার সাথে বস্তুগত বাস্তবতার রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক।

আইনস্টাইন বাস্তবতা বলতে *ভৌত* বাস্তবতাকেই বুঝাতে চান। এটি সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার যে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মতই তিনিও মনে করেন যে একটি বহির্বিশ্বের অর্থাৎ একটি বস্তুগত জগতের অস্তিত্ব রয়েছে, এবং এই বিশ্ব মানুষের পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে না। এ সম্পর্কে তাঁর উক্তি হল (২)

> পর্যবেক্ষণকারী বা অনুভবকারী অনপেক্ষ স্বাধীনভাবে একটি 'বর্হিজগতের অস্তিত্ব রয়েছে'– এই বিশ্বাসই হল সকল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভিত্তি। কিন্তু যেহেতু আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অনুভূতি বা প্রত্যক্ষণ এই বর্হিবিশ্ব বা ভৌত বাস্তবতা সম্পর্কে অপ্রত্যক্ষ তথ্য বা জ্ঞান দান করে, সেহেতু শেষোক্ত বিষয় সম্পর্কে আমাদের অনুধাবন করতে হয় মস্তিষ্ক চালিত অনুধ্যানের (speculative means) মাধ্যমে। সুতরাং এ থেকে বলা যায় যে ভৌত বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি চূড়ান্ত নয়, বা এ সম্পর্কে বক্তব্য শেষ কথা হতে পারে না। আমাদের সব সময় প্রস্তুত থাকতে হয় এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের জন্য– অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ খচিত পদার্থবিদ্যার কাঠামো পরিবর্তনের জন্য আমাদের সদা প্রস্তুত থাকতে হবে, যাতে আমরা প্রত্যক্ষিত তথ্যাবলীর প্রতি যৌক্তিকভাবে সুবিচার করতে পারি।

আইনস্টাইনের মৌলিক নীতি

আইনস্টাইনের বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা দুটি মৌলিক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত (১). পর্যবেক্ষক অনপেক্ষ একটি বর্হিবিশ্বের অস্তিত্ব, (২). ভৌত জগতের ঘটনাবলী কার্য কারণ সুত্রে বাঁধা, (৩). নিশ্চয়তাবাদ। অবশ্য কার্য কারণ ও নিশ্চয়তাবাদ এই ধারণা দুটি একে অপরের পরিপুরক। আর আধুনিক পদার্থবিদ্যার সর্বত্তোম অস্ত্র কোয়ন্টাম বলবিদ্যা চিরায়ত পদার্থবিদ্যার এই দুটি মৌলিক ভিত্তিকেই আঘাত হেনেছে। এছাড়া অনুজগতের বাস্ত বতার স্বরূপ পর্যবেক্ষণ অনপেক্ষ নয়। কারণ কোয়ন্টাম পদার্থবিদ্যার ধারণায় পর্যবেক্ষণীয় সত্তা ও পর্যবেক্ষণকারী যন্ত্রব্যবস্থা পরস্স্পর সম্স্লৃক্ত। চিরায়ত ধারণায় কিন্তু এটি গ্রহণ যোগ্য নয়। অর্থাৎ ভৌত বাস্তবতা অবশ্যই পরিমাপন প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে না। আমি দুরবীক্ষন যন্ত্র দিয়ে বৃহস্স্পতির একটি উপগ্রহের গতি ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ করছি। দুরবীক্ষণ যন্ত্র বৃহস্স্পতির পর্যবেক্ষণাধীন কোন উপগ্রহের গতি বা অবস্থানকে প্রভাবিত করে না। এ কারণেই কোয়ন্টাম পদার্থবিদ্যার প্রতিষ্ঠা ও পদ্ধতিগত উন্নয়নে অসাধারণ পথিকৃতের ভুমিকা পালন করেও কোয়ন্টাম পদার্থবিদ্যার অন্তর্নির্হিত বাণীকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি, এর কারণ আণুবীক্ষনিক জগতে ১. কার্য কারণ সুত্রের জায়গায় কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সংখ্যায়নিক নিয়ম, ২. নিশ্চয়তাবাদের (determinism) স্থানে সম্ভাব্যতা (probability) স্থান করে নিয়েছে।

আইনস্টাইন তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রে সবসময় 'সম্ভাব্যতাকে' (probability) প্রকৃতির আচরণ বুঝতে অন্য যে কোন বৈজ্ঞানিক কৌশলের (device) মত ব্যবহার করেছেন। 'সম্ভাব্যতা' বা সংখ্যায়ন পদার্থবিদ্যাকে দেখেছেন একটি ভৌত কৌশল হিসেবে- এর মাধ্যমে ভৌত বাস্তবতার সম্স্লুর্ণ বিবরণ জানা যায় না।

আজীবন তিনি একদিকে কার্য কারণ সুত্র ও নিশ্চয়তাবাদকে ধারণ করে সাধারণ আপেক্ষিক তত্তেত্ম মধ্য দিয়ে অভিকর্ষ শক্তি ও তাড়িত চৌম্বক শক্তিকে একীভুত করার সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন, অন্য দিকে কোয়ন্টাম পদার্থবিদ্যার অনির্দেশ্যবাদ ও সংখ্যায়নিক চরিত্রের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন। বলা বাহুল্য এই দুটি যুদ্ধে তিনি ছিলেন একক ও নিঃসঙ্গ। কোয়ন্টাম পদার্থবিদ্যার অন্তর্নির্হিত অসম্স্লুর্ণতাকে মেনে নিয়েও সক্রিয় বিজ্ঞানীরা কোয়ন্টাম বলবিদ্যার শক্তিশালী হাতিয়ারকে ব্যবহার করতে পেছপা হন নি, বরং এর প্রয়োগ সীমা পদার্থবিদ্যার সীমা ছারিয়ে রসায়ন, জীববিদ্যাসহ অন্য শৃঙ্খলাতেও প্রযুক্ত হচ্ছে সাফল্যের সাথে।

বলা হয়ে থাকে এক ধরণের দার্শনিক নীতি নিষ্ঠতার কারণে শেষ দিকে কোয়ন্টাম জগৎ থেকে চিরতরে আইনস্টাইন সরে এসেছিলেন ১৯২৬ সালের পর থেকে। এ সময়েই তিনি জড়কণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোয়ন্টাম সংখ্যায়নের ওপর দুটি অসাধারণ প্রবন্ধ লিখে বোস-সংখ্যয়নকে সার্বজনীন রূপ দিয়েছিলেন এবং বোস-আইনস্টাইন ঘনীভবন সম্স্লর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন। কিন্তু কী সেই নীতি?

আইনস্টাইনের এই নীতি বা দর্শন সম্স্লর্কে অবশ্য কোন বই পড়ে জানা যায় না। আমরা ইতিমধ্যেই তাঁর নীতি সম্স্লর্কে কিছু ইঙ্গিত দিয়েছি। প্রথমত আমাদের পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতার বাইরে ভৌত বাস্তবতার অস্তিত্ব রয়েছে, দ্বিতীয়ত ঐ ভৌত বাস্তবতার কোন কোন উপাদান পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা পরিমাপ করতে পারি, যা থেকে ঐ ভৌত ড়্গাস্তবতার স্বরূপ বা প্রকৃতি সম্স্লর্কে আমরা ধারণা করতে পারি। সুতরাং ভৌত বাস্তবতা

আমাদের বোধগম্যতা 'কতিপয় ধারণার' ওপর প্রতিষ্ঠিত। তৃতীয়ত বিজ্ঞানের একটি উদ্দেশ্য হল প্রকৃতিকে বুঝবার চেষ্টা এবং প্রকৃতি কিভাবে কাজ করে অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মাবলীকে উদঘাটন করা, যে নিয়মাবলীকে প্রয়োগ করে ভৌত বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে পারি। চতুর্থত যেহেতু ধারণাসমুহ মস্তিষ্ক প্রসুত তাই এই ধারণার সাহয্যে নির্মিত ভৌত বাস্তবতার যে চিত্ররূপ আমরা তুলে ধরছি তা চুড়ান্ত নাও হতে পারে, কারণ ঐ ভৌত বাস্ত বতার সাথে সংস্লৃক্ত কোন নতুন গুণ বা উপাদান নতুন পরীক্ষায় ধরা পড়তে পারে– যা বর্তমান চিত্ররূপের সাথ খাপ খাচ্চে না। সেই প্রেক্ষিতে আমাদের নতুন ধারণার সৃষ্টি করতে হয়, নতুন তত্ত্ব দাঁড় করাতে হয় যা নতুন তথ্যকে অঙ্গিভুত করতে পারে, নতুন প্রপঞ্চ সম্স্লর্কে ভবিষ্যদ্বানী করতে সক্ষম। বলবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিভা আর্নস্ট ম্যাকের ওপর একটি রচিত প্রবন্ধে 'ধারণা'র শাশ্বততা সম্স্লর্কে আইনস্টাইন উক্তি করেছিলেন,(৩)

> এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, ধারণাসমুহ বিভিন্ন ঘটনাকে সুশৃঙ্খল ভাবে উপস্থাপনে অত্যন্ত উপযোগী, – এর ফলে ধারণাগুলো আমাদের চিন্তার ওপর এক ধরণের আধিপত্য বিস্তার করে থাকে যে আমরা প্রায়শ ভুলে যাই যে এগুলো আমাদেরই মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভুত। তখন এগুলো পরিণত হয়– "চিন্তার অত্যাবশ্যকতা", "প্রদত্ত পুর্ব নির্দিষ্ট জ্ঞান" (given a priori), ইত্যাদিতে। এ ধরণের ভ্রান্তির ফলে বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথ দীর্ঘ দিন অবরুদ্ধ হয়েছিল।" (ref: Phys. Zeitschr, 17, p101, 1916)

পঞ্চমত জাগতিক ঘটনাবলী কার্যকারণ সুত্রে বাঁধা অতএব নিশ্চয় করে অতীত ঘটনা ও ভবিষ্যৎ ঘটনার কথা বলা যায়।

উপরের আলোচনা এটি স্পষ্ট যে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাবিশ্বের বা ভৌত বাস্তবতার ধারণা চিরন্তন বা শাশ্বত নয়, তা সময়ের ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নীত হতে পারে যদি বিদ্যমান ধারণাগুলো অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়; এক কথায় বিজ্ঞান-গবেষণা একটি চলমান প্রক্রিয়া। আমাদের অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, স্বতঃসিদ্ধ-খচিত পদার্থবিজ্ঞানের গড়ন কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভুতি অভিজ্ঞতা বিচ্ছিন্ন নয়। আইনস্টাইন যে বার বার বলে থাকেন যে অভিজ্ঞতা অনপেক্ষ ভৌত বাস্তবতার অস্তিত্ব রয়েছে তা থেকে অনেকে মনে করেন তাঁর এই ধারণা কান্টিয় ঐতিহ্যে লালিত হওয়ার ফল অর্থাৎ কান্টের 'বস্তুর স্ব সত্তা' (thing in itself), যা স্বভাবগতভাবেই অজ্ঞেয়, এই দর্শন তাঁর ওপর প্রভাব ফেলেছে। বিজ্ঞানী যখন বলেন আমাদের প্রত্যক্ষণ অনপেক্ষ একটি বর্হিবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে, তখন অধিবিদ্যার দৃষ্টিতে একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়- 'বহিস্থতার অর্থ ' (meaning of externality) কী ? এ ধরণের অধিবিদ্যার সমস্যা সম্স্লর্কে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মত তিনিও নিশ্চুপ থাকেন।

কান্টের প্রসঙ্গে আইনস্টাইন বলেছেন, 'আমি কান্টিয় ঐতিহ্যে বড় হই নি, তবে তাঁর নীতিতে রয়েছে এমন অনেক কিছু মুল্যবান বিষয় এবং তার সাথে অনেক ত্রুটি এসবের সাথে পরিচিত হয়েছি। একটি বাক্যে রয়েছে– " বাস্তব আমাদের কাছে দেয়া হয়নি, আমাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে " (রহস্যময় প্রহেলিকা রূপে)। কান্ট সম্স্লর্কে আাইনস্টাইন আরও উল্লেখ করেছেন যে কান্টের মতে আমাদের চিন্তার জগতে 'ধারণাসমুহ' অন্ত্যন্ত প্রভাবশালী ভুমিকা পালন করে থাকে, এসব ধারণা অভিজ্ঞাপ্রসুত য়ৌক্তিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উদ্ভুত হয়না। (৪)

কান্টের ‘পুর্বনির্দ্দিষ্ট সংশ্লেষণী সিদ্ধান্তের’ (synthetic judgment a priori) অস্তিত্বের ধারণার সাথে আইনস্টাইন কখনও একমত হন নি। তাঁর মতে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-পুর্ব চিন্তার জন্য ‘আবশ্যিক পুর্ব প্রয়োজন’ (necessary pre-requisite) হল ‘ধারণাগত স্বাতন্ত্র্য’ (conceptual distinction); এই বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য হল এমন এক স্বাতন্ত্র্য যার একদিকে রয়েছে “ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভুতি বা ইন্দ্রিয়োপলব্ধি” (sense impression) এবং অন্যদিকে শুধুমাত্র ভাব (ideas)। এই স্বতন্ত্রতাকে বিবেচনা করতে হবে একটি 'শ্রেনী’ হিসেবে যা আমরা ব্যবহার করতে পারি– যাতে তাৎক্ষণিক ইন্দিয়ানুভুতি বা সংবেদনের জগতে পথ খুজে নেয়া যায়। ইন্দ্রিয় এবং এই স্বাতন্ত্র্যের যথার্থতা লুকিয়ে আছে এই সাফল্যে।

আইনস্টাইনের ভাবনায় পদার্থাবদ্যায় ‘বাস্তব’ হল এক জাতের কর্মসুচী– তবে এই কর্মসুচী পুর্ব নির্দ্দিষ্ট (a priori) কোন কিছু নয় যা পদার্থবিদকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। স্থুল জগতের রাজ্যে তো এ প্রশ্নই আসে না, এমন কি আণুবীক্ষণিক জগৎ ও স্থুল জগৎ এমনভাবে পরস্পর সম্পর্কিত যে যদি কেবল আণুবীক্ষণিক জগতের ক্ষেত্রে এই কর্মসুচী বর্জন করতে হয়, তাহলে তা হবে অব্যবহারিক। আইনস্টাইন বলছেন, ‘আমি তো কোয়ান্টাম ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণীয় তথ্যাদির মধ্যে এমন কিছু দেখছি না যে আমাদের তা করতে হবে। তবে অবশ্য কেউ যদি পুর্ব দৃষ্ট সত্য হিসেবে এই নীতিকে আঁকড়ে ধরে থাকেন যে কোয়ন্টাম বলবিদ্যার সংখ্যায়নিক পরিকল্পের মাধ্যমে প্রদত্ত ‘প্রকৃতির সংখ্যায়নিক বর্ণনাই চুড়ান্ত’ (statistical description of nature) সে কথা স্বতন্ত্র। কান্টের সাথে পদার্থবিদের চলার পথের মধ্যে পার্থক্য হল, কান্টের ঐ ‘শ্রেণীসমুহ’ (categories) অপরিবর্তনীয় ও পুর্ব নির্দ্দিষ্ট (a priori) কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানীরা তা মনে করেন না, বরং মনে করেন ‘মুক্ত প্রথা বা প্রচল’ (free convention), অবশ্য যৌক্তিকতার দৃষ্টিতে।

আইনস্টাইন মনে করেন না যে একটি ভৌত তত্ত্বে স্থান পাওয়া প্রতিটি স্বতন্ত্র ধারণাকে আলাদাভাবে এর যাথার্থ্য প্রমাণ করতে হবে। যদি তত্ত্বের যৌক্তিক কাঠামোর মধ্যে ধারণাগুলো প্রয়োজন অপরিহার্য মনে হয় তাহলে তত্ত্বটি সামগ্রিক অর্থে নিজের বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আর তাঁর মতে প্রতিটি তত্ত্বের প্রতিষঙ্গ হিসেবে উপস্থিত রয়েছে ভৌত বাস্তবতা। এক কথায় আমরা ভৌত বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে পারি তত্ত্বের মাধ্যমে। আর এই তত্ত্ব এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ধারনাগুলো ‘মনুষ্য মেধার মুক্ত উদ্ভাবন’ (free inventions of the human intellect)। আইনস্টাইন অবশ্যই মনে করেন না যে ‘তত্ত্ব বাস্তবতার প্রতিলিপি’। তিনি অবশ্যই অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করেন নি, - তার মতে অভিজ্ঞতাকে অবশ্যই কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে, তবে তাত্তিক বিশ্লেষণের প্রাথমিক স্তরে নয়, চুড়ান্ত পর্যায়ে। তাঁর মতে, (৫)

> ব্যাবস্থাটির গঠন গড়ে ওঠে যৌক্তিক কাজের ফসল থেকে; অভিজ্ঞতা লব্ধ আধেয়গুলো এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কসমুহ অবশ্যই এদের প্রতিনিধিত্ব তত্ত্ব উদ্ভুত সিদধান্ত সমুহের মধ্যে স্থান পাবে।

একাধিক তত্ত্ব যদি একই প্রতিভাসের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয় তাহলে কী হবে ? আইনস্টাইন এর জবাবে বলেছেন তখন বিচার্য হবে কোন তত্ত্বটি সরলতম বা কোনটি ব্যপকতম। আমরা যদি অনুকল্প হিসেবে গ্রহণ করি যে আমাদের বাস্তবতার ধারণা অবশ্য বিষয়মুখী হবে, আমরা দেখি যে আইনস্টাইনের কাজের মধ্যে এই অন্তর্নিহিত ধারণা বিদ্যমান যে ‘জগতের সর্বোত্তম বর্ণনা হল এর সরলতম প্রকাশ’। আবারও একটি উদাহরণ দেয়া যাক। সৌর জগতের গ্রহ-উপগ্রহাদির মহাকশের গতির বর্ণনা টলেমীর অসংখ্য উপক্ষক খচিত জটিল ভুকেন্দ্রিক তত্ত্ব ও

কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক সরল তত্ত্ব উভয়ের মাধ্যমেই প্রদান করা যায়; কিন্তু কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদটি অনেক বেশী সরল সহজেই অনুধাবনীয়, এবং ভবিষ্যদবানী করতে অনেক বেশী দক্ষ।

তিনি আরও বলেছেন, "আমাদের অভিজ্ঞতা যথার্থই এই বিশ্বাসের দিকে ঠেলে দেয় যে প্রকৃতি হল সরলতম অনুধাবনীয় গাণিতিক ভাবের (mathematical ideas) বাস্তবায়ন।" তাঁর সারল্যের নীতি (principle of simplicity) শুধু কেবল প্রভেদকারী নয়, গঠণমুলকও বটে। নতুন তত্ত্ব প্রস্তাবকালে তিনি এই নীতিকে চালক হিসেবে প্রয়োগ করেন। এটি সম্ভব যদি আমরা এর অর্থকে কিছুটা সীমার মধ্যে রাখি, এবং এটিকে গাণিতিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রাখি। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে (৬)ঃ

> গাণিতিকভাবে বিদ্যমান সরল ক্ষেত্রসমুহের সীমাবদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে এবং এদের মধ্যে সম্ভাব্য সরল সমীকরণসমুহের উপস্থিতির মধ্যে নিহিত রয়েছে 'বাস্তবকে তার সকল গভীরতা নিয়ে হৃদয়ঙ্গম' করার তাত্ত্বিকের আশা।

সুতরাং গণিতের এবং জ্যামিতির মাধ্যমে আমরা আমাদের তত্ত্বকে বাস্তবতার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে প্রয়াস পাই। তবে আমাদের এ সম্পর্কে অবশ্য সতর্ক থাকতে হবে, কারণ আইনস্টাইন গণিতের সাথে বাস্তবতার সম্পর্ক নিয়ে যে সাবধান বানী উচ্চারণ করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য (৭)ঃ

> বাস্তবতার প্রসঙ্গে গণিতের যে সব নিয়মাবলী রয়েছে এরা সুনিশ্চিত নয়; আর যেগুলো সুনিশ্চিত তাদের সাথে বাস্তবতার কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই।

স্থুল জগৎ ও আণুবীক্ষণিক জগতের দ্বন্দ্ব

তাহলে ব্যাপারটি কী দাঁড়াচ্ছে ? ভৌত বাস্তবের স্বরূপ কী, মহাবিশ্বই বা কী দিয়ে তৈরী ? মহাবিশ্ব যদি ভৌত বাস্তবতা হয়, তাহলে এর নির্মাণ বস্তুনিচয় হবে এর উপাদান। আর এ সব উপাদানের ধর্ম ও চরিত্র বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে উদঘাটন করলেই আমাদের কাছে ভৌত বাস্তবতার প্রকৃতি ও স্বভাব পরিস্ফুট হয়।

পদার্থবিজ্ঞান এ সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছে যুগ যুগ ধরে। জগতকে দেখার জন্য বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যা দুটি শক্তিশালী পন্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছে। একটি হল আইনস্টাইন উদ্ভাবিত সাধারণ আপেক্ষিকতা যা স্থুল জগৎ বর্ণনার পাশুপাত অস্ত্র। অন্য পন্থাটি হল 'কোয়ন্টাম বলবিদ্যা' যা আণুবীক্ষণিক মাত্রার বস্তুসমুহের (অণু, পরমাণু, ইলেকট্রন, প্রোটন ..) বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়। মহাবিশ্ব কিভাবে কাজ করে এ সম্পর্কে আমাদের অনুধাবন দুটি পরিষ্কার রূপ নিতে পারে ঃ প্রথমত ধারনাগতভাবে প্রকৃতিকে বুঝবার চেষ্টা– সাধারণভাবে আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার উপমাসমুহের মধ্য দিয়ে, অথবা দ্বিতীয়ত অনুসন্ধানের ভিত্তিতে পরিমাণগতভাবে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলার দক্ষতা। চিরায়ত পদার্থবিদ্যার বিসদৃশ, কয়েক দশক ধরে প্রকৃতির একটি ধারণাগত চিত্র নির্মাণের চেষ্টা কোয়ন্টাম বলবিদ্যা অগ্রাহ্য করেছে। প্রকৃতি কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা প্রদত্ত বর্ণনা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সাথে এবং সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের সাথে এটি সঙ্গতিপুর্ণ নয়। তবে প্রকৃতি কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা প্রদত্ত বর্ণনা তত সুন্দর নয়– এ সিদ্ধান্তে

আসা শক্ত, কারণ পরীক্ষণের ফলাফল সম্স্লর্কে যথেষ্ট সুক্ষ্মতার সাথে ভবিষ্যদ্বাণী করার কাজে পদার্থবিদগণ এটি ব্যবহার করে থাকেন। আসল দ্বন্দ্ব হল দৃষ্টিভঙ্গী ও দর্শনগত, এ কারণেই দুটি তত্ত্বকে সমন্বয় করার সকল প্রচেষ্টা এ পর্যন্ত বিফল হয়েছে। চিরায়ত পদার্থবিদ্যা হল নিশ্চিতবাদী এবং পরীক্ষণ ত্রটির সীমায় যে কোন প্রতিভাসের সঠিক বর্ণনা ও এ সম্স্লর্কে নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বানী করা সম্ভব। অন্য দিকে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী মুলত অনিশচয়তাবাদী এবং পদার্থবিদ্যা কোন ঘটনা ঘটবার সুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বানী করে না, যা করতে পারে তা হল ঘটনাটি ঘটার কতটা সম্ভাবনা রয়েছে। আবারও একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ধরা যাক একটি সরল মসৃন রাস্তার ওপর দিয়ে একটি মোটর গাড়ী চলছে, পথে একটি বিশাল উষ্ট্র-পৃষ্ঠাকৃতির দ্রুতি নিরোধের সম্মুখীন হল। চিরায়ত বলবিদ্যা বলে যে গাড়ীটির গতীয় শক্তি যদি দেওয়ালটির নিরোধ শক্তির চাইতে বেশী হয় তাহলে গাড়ীটি বাধা অতিক্রম করে যেতে পারবে, অন্যথায় পারবে না। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলে, আপাত দৃষ্টিতে তা যতই বিদঘুটে প্রতীয়মান হোক, গাড়ীটির গতীয় শক্তি নিরোধ শক্তির কম হলেও এটির দেওয়াল ভেদ করে রাস্তার ওপারে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তা যত ক্ষীণই হোক। এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে মেলে না। দ্বন্দ্বের সংক্ষিপ্তসার এভাবে তুলে ধরতে পারি।

সম্স্লুর্ণতা বাদী আইনস্টাইনের ভাবনায় ছিল আমরা নিশ্চয় তত্ত্বীয়ভাবে ভৌত সত্তার একটি কাঠামো নির্মাণ করতে পারি যার মাধ্যমে পরীক্ষণ শর্ত নিরপেক্ষ প্রতিভাসের, যা ভৌত ব্যবস্থার উপাদান হতে পারে, ব্যখ্যা দিতে পারি। বিজ্ঞান চর্চ্চার মুখ্য উদ্দেশ্য হল 'প্রকৃতি কেমন এবং কি নিয়মে' চলে তা আবিষ্কার করা। আইনস্টাইনের মতে '*পদার্থবিদ্যার চেষ্টা হল বাস্তবতার স্বরূপকে অনুধাবন করা– যে বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ ব্যতিরেকেই বিদ্যমান। এই অর্থেই "ভৌত বাস্তবতার" কথা বলা হয়ে থাকে। কোয়ন্টাম পুর্ব সময়ের পদার্থবিদ্যায় এটি কি ভাবে বুঝতে হবে সে সম্স্লর্কে কোন দ্বিধা ছিল না। নিউটনের তত্ত্বে স্থান ও কালে অবস্থিত একটি জড় বিন্দু দ্বারা বাস্তবতা নির্ণীত হত; ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বে স্থান ও কালে ক্ষেত্র দিয়ে।*'

অন্যপক্ষে কোয়ন্টামবাদীদের বক্তব্য হল 'স্থুল জগৎ' ও 'অব-পারমাণবিক জগৎ' নিয়ে বিভেদ রচনা নিরর্থক; 'কোয়ন্টাম জগৎ' বলে কিছু নেই। আমরা কোন ভৌত প্রপঞ্চের বিমুর্ত কোয়ন্টাম বর্ণনা দিতে পারি মাত্র। কোয়ন্টামবাদীদের প্রধান মুখপাত্র নীলস বোর বলতেন যে " 'প্রকৃতি কেমন তা আবিষ্কার করা'– এটি পদার্থবিদ্যার কাজ নয়; প্রকৃতি সম্স্লর্কে আমরা কী বলতে পারি এবং কিভাবে বলতে পারি, আর এটিই বিজ্ঞানের কাজ।" এই দ্বন্দ্বের মুলে রয়েছে জড় কণিকা ও বিকিরণ বা শক্তির দ্বৈত সত্তা যার নাম 'তরঙ্গ-কণিকা'। এর অর্থ একটি কণিকার এক দিকে যেমন জড় ধর্ম রয়েছে, আবার শর্তাধীনে এর তরঙ্গ ধর্মও প্রকাশ পায়; একইভাবে বিকিরণ যেমন স্বভাবতই তরঙ্গ প্রকৃতির, কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে জড় কণিকা রূপেও দেখা দিতে পারে। চিরায়ত দৃষ্টিতে এটি একটি অসম্বভ ব্যাপার। তবে সব চাইতে বড় কথা হল আমাদের ভৌত জগতের প্রকৃতি ধরা পড়ে পর্যবেক্ষণ মুহুর্তে, সুতরাং এর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষক নিরপেক্ষ নয়। পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষক নিরীক্ষ্য ভৌত সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং পর্যবেক্ষন অনপেক্ষ বা পর্যবেক্ষণ পুর্ব ভৌত বাস্তবতার প্রকতির স্বরূপ কী এ প্রশ্ন অবান্তর। আইনস্টাইন কিন্তু কোয়ন্টাম পদার্থবিদ্যার অভাবনীয় সাফল্য সম্স্লর্কে প্রশ্ন তোলেন নি। তাঁর সুক্ষ্ম দার্শনিক প্রশ্ন ছিল সুক্ষ্ম অসম্স্লুর্ণতা নিয়ে। স্থুল জগৎ বনাম আণুবীক্ষণিক জগতের দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে আইনস্টাইনের মন্তব্য হল (৮)ঃ

সম্ভবত এ কারণেই ভবিষ্যতের পদার্থবিদ্যার তত্ত্বীয় ভিত্তিটি কী রূপে দেখা দেবে এই প্রশ্নে সাম্প্রতিক কালের তাত্ত্বিক পদার্থবিদগণের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী মতামত বিদ্যমান। এটি কি হবে একটি ক্ষেত্র তত্ত্ব ; অথবা এটি কি হবে সারতঃ একটি সংখ্যায়নিক তত্ত্ব ?

কোয়ন্টাম বলবিদ্যার স্বভাবজ সংখ্যয়নিক চরিত্র, অনির্দেশ্যতা এবং ভৌত বাস্তবতা সম্পর্কে অস্পষ্টতা আইনস্টাইনকে বিচলিত করেছিল। এ কারণেই দুঃখ বোধ থেকে এক সময় বলেছিলেন ' ঈশ্বর বিশ্বকে নিয়ে পাশা খেলেন না।' ক্ষুব্ধচিত্ত আইনস্টাইন ম্যাক্স বর্ণ্কে লিখেছিলেন,

> পাশা খেলুড়ে ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাস করেন না'; ... .. *আমাদের দুজনের বৈজ্ঞানিক প্রত্যাশার ক্ষেত্রে আমরা দুজনে দুই মেরুতে অবস্থান করছি। আপনি পাশা খেলুড়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, আর আমি বস্তুজগতের পরিপুর্ণ নিখুঁত নিয়মে বিশ্বাসী - যে বস্তুজগতে সব কিছু বাস্তব বস্তু নিচয় রূপে বিরাজ করে– যা আমি অনুধাবন করতে চাই, বলতে পারেন, অনেকটা বন্যের মত কল্পজাগতিক পদ্ধতিতে।* (বর্ণ্কে লেখা আইনস্টাইনের চিঠি, ৭ই নভেম্বর, ১৯৪৪)।

আইনস্টাইন-রবীন্দ্রনাথ কথোপকথন ঃ বাস্তবতার প্রকৃতি

জার্মানীর এক ছোট্ট শহর ক্যাপুথ। সেখানে ১৯৩০ সালের জুলাই মাসের ১৪ তারিখে এক মনোরম গ্রীষ্মের নরোম বিকেলে বিংশ শতাব্দীর অসামান্য দুই শ্রেষ্ঠ মনন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আলবার্ট আইনস্টাইনের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। এটি সম্ভবত তাঁদের মধ্যে তৃতীয় সাক্ষাৎকার– ঘটেছিল আইনস্টাইনের বাসায় ছোট টিলার ওপরে।

বাসাটি ছিল বাদামী কাঠ দিয়ে তৈরী– ওপরে লাল টালির ছাদ। আর চারদিকে অতন্দ্র প্রহরীর মত সারি সারি পাইন গাছের সমাহার। সে সময় দুজনেই নোবেল পুরস্কারে ভুষিত হয়েছেন – রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে, ১৯১৩ সালে, আর আইনস্টাইন ১৯২১ সালে পদার্থবিদ্যায়। ৪২ বছরের আইনস্টাইন টিলার ওপর থেকে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন তাঁর ৭২ বছর বয়স্ক অতিথি রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানাতে। সে মুহূর্তের ছবিটি রবীন্দ্রনাথ পরে এভাবে রোমন্থন করেছেন, " *তাঁর ঝাঁকরা শুভ্র কেশ, তাঁর জ্বলন্ত চোখ, তাঁর উষ্ণ আচরন আমাকে আবারও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল এই মানুষটির মানবিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে– যিনি জ্যামিতি আর গণিতের বিমুর্ত জগতে কত স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে থাকেন।*" কবি আরও মনে রেখেছেন তাঁর সারল্যে অভিভুত হয়ে, " *তাঁর মধ্যে কোন আড়ষ্টতা আমি লক্ষ্য করিনি, কোন ধরণের বুদ্ধিজীবী সুলভ নিস্পৃহতাও দেখি নি। তাঁর মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি এমন একটি মানুষকে যিনি মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ককে মুল্য দিয়ে থাকেন এবং আমার প্রতি ছিল অপার ঔৎসুক্য ও আমাকে বুঝবার অদম্য আগ্রহ।*"

দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ঘটেছিল এ বছরই ১৯শে আগস্ট তারিখে একই স্থানে। বস্তুত এই সাক্ষাৎকারটি এর আগের সাক্ষাতের রেশ বা ধারাবাহিততা মাত্র।

ভারতের দুই মহান ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ছিল আইনস্টাইনের গভীর শ্রদ্ধাবোধ, অন্যদিকে তাঁরা উভয়েই আইনস্টাইনের মধ্যে দেখেছিলেন জ্ঞানের প্রজ্বলিত শিখা ও প্রবল শক্তি। এই তিনজনের মধ্যে জীবন বোধে পার্থক্য থাকলেও মনুষ্যবোধের প্রতি ভালবাসা ও বিশ্ব মানবতাকে এক সুতায় গাঁথার লক্ষ্যে ও তাদের জন্য শান্তির বিশ্ব তৈরীর নিরলস চেষ্টা তাঁদেরকে এক মোহনায় নিয়ে এসেছিল। বিশ্ব শান্তির অন্বেষায় আইনস্টাইন একটি চমৎকার উক্তি করেছিলেন, "যে সব আদর্শ আমার চলার পথকে আলোকিত করেছে, এবং জীবনকে আনন্দের সাথে মুখোমুখী হতে কালে কালে আমার জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে দেখা দিয়েছে– সেগুলো হচ্ছে দয়া, সৌন্দর্য, আর সত্য।" রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীও এ সব মুল্যবোধের আলোয় নিজেদের চলার পথকে আলোকিত করেছিলেন।

সম্ভবত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান প্রতিভা আইনস্টাইন সম্স্লর্কে রবীন্দ্রনাথের মুল্যায়ন ছিল অনেকটা এ রকম ঃ

> আইনস্টাইনকে প্রায়শঃ বলা হয়ে থাকে নিঃসঙ্গ পথিক। দৈনন্দিন জীবনের হাজারো সাধারণ ঝামেলা থেকে গণিতের জগতে আত্মনিমগ্ন থেকে তিনি চাইতেন মনকে প্রসারিত করতে, উন্মুক্ত করতে মহাবিশেত্ম সীমাহীন আঙ্গিনায়। আর এ কারণেই, অমার মনে হয়, তিনি নিভৃতচারী হয়ে পড়েন। তাঁর এই একাগ্র গণিত সাধনাকে বলা যেতে পারে– 'মনুষ্যজ্ঞানাতীত বস্তুবাদ', যা তাঁকে পৌছে দিয়েছিল অধিবিদ্যার প্রান্তসীমায়– যেখানে তিনি নিজের স্বার্থের জগতের সকল বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন। আমার কাছে মনে হয়, আমাদের জীববৈদ্যিক চাহিদার অনেক ঊর্দ্ধে, 'বিজ্ঞান আর শিল্প' উভয়ই হল আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বর্হিপ্রকাশ এবং ধারণ করে আছে আমাদের সর্বোত্তম মুল্যবোধ। আইনস্টাইন ছিলেন একজন চমৎকার সন্ধানী প্রশ্নকারী। আমরা অনেক্ষণ ধরে কথা বলেছিলাম এবং আন্তরিকতার সাথে, নানা বিষয়ে। এর মধ্যে ছিল "মানুষের ধর্ম" সম্স্লর্কে আমার ধারণা নিয়ে ঔৎসুক্যময় মনোজ্ঞ আলোচনা। এই কথোপকথনের মাঝখানে মাঝে মধ্যেই ছিল তাঁর নিজস্ব সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীক্ষ্ণ মন্তব্য, এড়্গাং তাঁর এই প্রশ্ন থেকে আমার বুঝতে অসুবিধা হয় নি তাঁর নিজস্ব চিন্তার স্রোতধারা কোনদিকে বইছে।

অন্যদিকে আইনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন–

> প্রয়োজন আর অন্ধকার থেকে উঠে আসা মানুষগুলো অস্তিত্বের জন্য কি ক্লান্তিকর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তা আপনি জানেন। আপনি গভীর ধ্যানমগ্নতায় ও সৌন্দর্যের কারুকার্যতার মধ্যদিয়ে মুক্তির সন্ধান করছেন। এ সব চর্চ্চার মাধ্যমে আপনার দীর্ঘ সফল জীবনের মধ্য দিয়ে মানবতার সেবা করে চলেছেন, সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছেন একটি সুশান্ত উৎসাহ ও জীবনীশক্তি .. ..

আইনস্টাইন কবিগুরু সম্স্লর্কে আরও উচ্চারণ করেছেন,

> .. .. .. আমাদের কাছে তিনি হয়ে উঠেছেন আত্মশক্তির, আলোর, এবং ঐকতানের জীবন্ত প্রতীক – মহান মুক্ত বিহঙ্গসম প্রবল ঝড়ের মধ্যেও উচ্চাকাশে উড্ডীন – অনন্ত নিত্যতার সঙ্গীত যেন অ্যারিয়েল তাঁর বীনায় সুরের ঝংকার তুলছেন, অবিচ্ছিন্ন ভাবাবেগের সমুদ্রের ওপরে উঠে। কিন্তু তাঁর শিল্প কখনও

মনুষ্যত্বের ক্লেশের প্রতি বা সাধারণ মানুষের সংগ্রামের প্রতি উদাসীন ছিল না। মনুষ্যত্ব রক্ষায় তিনি 'মহান প্রহরী'। যা কিছুর জন্য আমরা, বা আমরা যা কিছু সৃষ্টি করেছি তার মুল ও শাখা প্রশাখা অন্ত র্নিহিত রয়েছে ঐ মহতী গঙ্গার কবিতা ও ভালবাসায়।

সব দিক থেকেই এই দুটি মানুষ ভিন্ন প্রকৃতির ঃ জাতীয়তা, সাংস্কৃতিক পটভুমি পেশা ও চিন্তা চেতনায়। কিন্তু তবুও উভয় সাক্ষাতেই দু'জনে অন্তরঙ্গ আলোচনায় মেতে উঠেছিলেন বাস্তবতার প্রকৃতি, সত্য ও সৌন্দর্য সঙ্গীত আরও নানা বিষয় নিয়ে; একে অন্যকে জানার এবং দুজনে দুজনের অবদানকে বুঝবার অদম্য আগ্রহ নিয়ে; তাঁদের সত্য সন্ধানের পথকে জানার এবং উভয়ের সঙ্গীত ও শিল্পের প্রতি ভালবাসার উৎস কোথায় তা জানতে অসীম কৌতুহল নিয়ে। এই আলোচনা থেকেই বোঝা যায় জ্ঞানের কত গভীরে ছিল এঁদের অনায়াস যাতায়াত, বোঝা যায় কবি পদার্থবিদ্যার আধুনিকতম উন্নতি সম্স্লর্কে কতটা সম্যক ছিলেন।

উভয় সাক্ষাৎ কালেই আইনস্টাইনের এক নিকট আত্মীয় দিমিত্রি ম্যারিয়ানোফ উপস্থিত ছিলেন এবং উভয়ের সংলাপের রেকর্ড রেখেছিলেন। দিমিত্রির বর্ণনা অনুযায়ী আইনস্টাইনের মহান অতিথি বিকেল চারটায় উপস্থিত হলে আইনস্টাইন টিলা থেকে নীচে নেমে এসে কবিকে অভ্যর্থনা জানায়। উভয়ে পাশাপাশি হেটে চলছিলেন রাস্তা ধরে। কবির পরনে ছিল হাল্কা নীল রংয়ের স্যুট - তিনি ধীর পায়ে সামনের দিকে সামান্য ঝুকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, একটি হাত বেঁকে পেছনে রাখা। তার পাশে হেটে চলেছেন শক্ত সমর্থ ঋজু আইনস্টাইন .. .. ।

রবীন্দ্রনাথ সম্স্লর্কে বলেছেন দিমিত্রি, 'একজন চিন্তাশীল মস্তিষ্কের কবি', আর আইনস্টাইনকে লক্ষ্য করে উক্তি করেছেন, 'কবি-মস্তিষ্ক চিন্তাশীল মানুষ'। তিনি আরও বলেছেন কথোপকথনটি ছিল 'যেন দুটি গ্রহের মধ্যে আত্মমগ্ন আলাপচারিতা'। ম্যারিয়ানোফ প্রথমে এই সাক্ষাতের একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিনে ১০ই আগস্ট তারিখে, ১৯৩০ সালে প্রকাশ করেছিলেন। (৯) পরবর্তীকালে 'কেনিয়ন রিভিউ'র (Kenyon Review) একটি বিশেষ সংক্যায় আরও বিশদ আকারে শেষ সাক্ষাতের বিষয়সমুহকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশিত হয়। নোবেল পুরস্কারের একশত বর্ষ পুর্তি উপলক্ষ্যে 'কালচারস্ এন্ড ক্রিয়েটিভিটি' (Cultures and Creativity) নামক জার্নালে এটি পুনরায় প্রকাশিত হয়।

দিমিত্রি বলেছেন যে প্রথম দিনের (১৪ই জুলাই) আলোচনা পর্বটি চলেছিল '*সত্য ও বাস্তবতার প্রকৃতিকে*' ঘিরে। কবি শুরু করেছিলেন '*আপনি গণিতের সাহয্যে দুটি প্রাচীনতম সত্তা 'স্থান ও কালে'র রহস্য উদ্ধারের পেছনে ছুটছেন, আর আমি এদেশে বক্তৃতা দিয়ে চলেছি মানুষের 'শাশ্বত জগৎ অর্থাৎ বাস্তবতার মহাবিশ্বে'র ওপর।*' আইনস্টাইনের প্রশ্ন ছিল কবির কাছে, '*জগৎ বিচ্ছিন্ন কোন ঐশ্বরিক সত্তায় আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন।*' এভাবেই তাদের আলোচনার অর্গল দ্বার খুলে যায়।

পৃথিবীতে আভির্ভুত হওয়ার পর থেকেই মানুষ নিজেকে প্রশ্ন করেছে 'আমি কোথা থেকে এলাম? আমার চার পাশে যা দেখছি প্রকৃতি, নিসর্গ, বৈচিত্র্যময় প্রানী জগৎ, অপার রহস্যঘেরা মহাবিশ্ব –তার সাথে আমার সম্স্লর্ক কী ?' এই প্রশ্নকে আবর্তিত করেই মানুষ নির্মাণ করেছে সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি– মহা বিশ্বলোকের রহস্য উন্মোচনের চাবিকাঠি প্রায় তার হাতের মুঠোয়। তবুও যুগযুগ ধরে ভাবুক, জ্ঞানসাধক, সত্যসন্ধানী, দার্শনিক, বিজ্ঞানী এমন কি সাধারণ মানুষ বার বার নিজেকে প্রশ্ন করেছে এই যে জগৎ আমরা

আমাদের চারপাশে দেখি, তা কী বাস্তব না কেবলই আপাত 'প্রতিয়মান' (appearance)? এটি যদি 'প্রতিয়মান' মাত্র হয় তাহলে এর পেছনে কী কোন বাস্তবতা রয়েছে? এই বাস্তবতা কি ঐশ্বরিক, এবং এর সাথে দৃশ্যমান জগতের সাথে সম্পর্কই বা কি এবং কোথায়? নিরলস বিজ্ঞান সাধনার মধ্য দিয়ে আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি তা কি সিদ্ধ বা বৈধ (valid) ? এসব প্রশ্ন মানুষের মনকে আলোড়িত করে এসেছে যখন থেকে সে দর্শনসুলভ চিন্ত ধারা করতে শিখেছে– ধর্মগ্রন্থের শেখানো বুলি যখন তাকে আর সন্তুষ্টি দিতে পারে না। চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হল বিংশ শতাব্দীর দুই শ্রেষ্ঠ মনীষার আলাপচারিতা এই 'শাশ্বত প্রশ্ন নিয়েই শুরু হয়– বাস্তবতার প্রকৃতি' বা স্বভাব নিয়ে (nature of reality)। বিজ্ঞানীই শুরু করেন কবিকে এই প্রশ্ন দিয়ে যে, তিনি জগৎ বিচ্ছিন্ন কোন ঐশ্বরিক সত্তায় বিশ্বাসী কি না, এড়াং এই সত্তার সাথে আপাত দৃশ্যমান বস্তু জগতের সম্পর্কই বা কি ?

কবি বলেছিলেন যে এ ধরনের কোন বিচ্ছিন্ন সত্তায় তাঁর কোন আস্থা নেই। মানুষের অসীম ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়েই মহাবিশ্বের প্রকাশ। আইনস্টাইনের অবস্থান অনেকটা ছিল 'সত্য তাহলে, অথবা সৌন্দর্য মানুষের অস্তিত্ব অনপেক্ষ নয় ?' তাহলে কি মানুষ না থাকলে 'বেলভেদরের অ্যাপোলোর সৌন্দর্যের অস্তিত্ব থাকবে না' – এই ছিল বিজ্ঞানীর জিজ্ঞাসা (If there were no human beings any more, the Apollo of Belvedere no longer would be beautiful ?)। জবাবে কবির উত্তর ছিল 'না'; তিনি আরও বলেছিলেন যে মানুষের মধ্য দিয়েই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 'যদি এমন কিছু সত্য থাকে যা মনুষ্য মনের কাছে অনুভূতিময় (sensuous) নয়, বা মানুষের মনে যৌক্তিক সম্পর্ক হিসেবে ধরা না পড়ে, - তাহলে এ ধরণের সত্যের কোন তাৎপর্য আমাদের কাছে বহন করে না, যতক্ষণ আমরা মানুষ রয়েছি।' (.. .. if there be some truth which has no sensuous or rational relation to human mind , it will ever remain as nothing so long as we remain human beings.)

এত বিষয় থাকতে আইনস্টাইন কেন এ প্রশ্নটি কবির কাছে উত্থাপন করলেন - এটি একটি বিস্ময় তো বটেই। তবে পশ্চাদপটটি জানা থাকলে হয়তো বিষয়টি কিছুটা পরিষ্কার হবে। প্রথমত সে সময়টা একটি ক্রান্তির মধ্য দিয়ে বিশ্ব অতিক্রম করছিল, প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে অভাবিত বস্তুগত উন্নয়ন সাধিত হলেও বিশ্ব আর একটি মহাযুদ্ধের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছিল, শান্তিবাদী ও যুদ্ধবিরোধী বিক্ষুব্ধ আইনস্টাইন হয়তো পশ্চিমী বস্তুগত সভ্যতা– এর দার্শনিকতা নিয়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন, তাই হয়তো প্রাচ্যের শান্তিময় রহস্যবাদের মধ্যে খুঁজতে চেয়েছিলেন সমাধান। আর সে সময় প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কে হতে পারে ? আর একটি বিষয়ও হয়তো বিজ্ঞানীর ভাবনার পশ্চাদপট হিসেবে কাজ করছিল– তা হল গত কয়েক বছর ধরে ১৯২৭-১৯৩০ সাল পর্যন্ত দুটি সলভে সম্মেলনে নীলস বোরের সাথে আইনস্টাইন ভৌত বাস্তবতার স্বরূপ নিয়ে যে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন তার রেশ হয়তো বিজ্ঞানীর মনে ক্রিয়াশীল ছিল। এরই বর্হিপ্রকাশ হয়তো ঘটেছিল কবিকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার মধ্যে? বোরের বক্তব্যের মুল সুর ছিল কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার আলোকে পর্যবেক্ষক অনপেক্ষ ভৌত বাস্তবতার কোন অস্তিত্ব নেই, পরীক্ষনই নির্ধারণ করবে এই বাস্তবতার স্বরূপ। বিষয়মুখীন বাস্ত বতা পরীক্ষণের মধ্য দিয়েই ধরা দেয়– এবং কোয়ন্টাম নিয়ম বলে দেয় ভৌত বাস্তবাতার কোন উপাদানটি পর্যবেক্ষণীয়। অন্য দিকে কার্যকারণবাদী ও নির্দিষ্টবাদী আইনস্টাইন মনে করেন ভৌত বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষক অনপেক্ষ– এর একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে যার উপাদানগুলো তত্ত্ব ও পরীক্ষণের মাধ্যমে আমাদের কাছে ধরা দেয়।

সম্ভবত মিস্টিক নামে পরিচিত কবির কাছে প্রাচ্যের ধারণা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার কৌতুহল থেকে বিজ্ঞানী এ প্রশ্নের অবতারনা করেছিলেন। কবি বলেছিলেন জড় পদার্থ অসংখ্য বস্তু কণিকা (ইলেকট্রন, প্রোটন, ...) সমন্বয়ে গঠিত হলেও এর মধ্যে ফাঁক রয়েছে, কিন্তু জড় যখন কঠিন বস্তুর রূপ নিয়ে দেখা তখন এই আপাত ফাঁকসমুহ দেখা যায় না– মনে হয় সন্তত- এ যেন বিচ্ছিন্ন জড় কণিকাগুলোকে একত্র করার চেষ্টা। কবির দৃষ্টিতে ঠিক একইভাবে মনুষ্যত্ব স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত, কিন্তু এদের মধ্যে মনুষ্যত্বের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে স্থাপিত হয়েছে পারস্পরিক সম্পর্ক যা থেকে উদ্ভুত হয়েছে মানুষের জগতের জীবন্ত ঐক্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'আমাদের সাথে, ব্যক্তি মানুষ হিসেবে, সমগ্র মহাবিশ্বের সংযোগ স্থাপিত।' একেই তিনি আখ্যায়িত করেছেন 'মনুষ্য মহাবিশ্ব' নামে। আর মানুষে মানুষে সম্পর্কে মধ্যদিয়ে গড়ে ওঠা সত্তাকে বলেছেন 'মহা মনুষ্যত্ব' বা অসীম মানুষ বা মানুষের অনন্ত ব্যক্তিত্ব।

এই আলোচনায় আইনস্টাইনের বক্তব্যে দেখা যায় মহাবিশ্বের প্রকৃতি সম্পর্কে দুটি ধারণা রয়েছে একটি হল মানুষের দেখা একটি '*একক হিসেবে জগতের রূপ*', আর অন্যটি হল '*বাস্তবতা রূপে জগৎ*', যা মানবীয় উপাদান নিরপেক্ষ। তাঁর ভাষায়ঃ '*মহাবিশ্বের স্বরূপ নিয়ে দুটি ধারণা রয়েছে– জগৎ হল একটি একক সত্তা যা মনুষ্যত্বের ওপর নির্ভরশীল, এবং অন্যটি হল জগৎ একটি বাস্তবতা যা মনুষ্য উপাদানের ওপর নির্ভর করে না।*' এই ভৌত বাস্তবতার অস্তিত্ব মানুষের থাকা না থাকার ওপর মোটেই নির্ভরশীল নয়। উদাহরণ হিসেবে বলেছেন জ্যামিতিতে ব্যবহৃত পিথাগোরীয় উপপাদ্যের বক্তব্য মানুষের অস্তিত্ব নিরপেক্ষ। আইনস্টাইনের ধারণায় বৈজ্ঞানিক সত্যকে বিবেচনা করতে হবে মনুষ্যত্ব অনপেক্ষ বৈধ সত্য হিসেবে। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন সত্য আমাদের চেতনা নির্ভর কি না ? তাঁর মতে মনুষ্যত্ব অনপেক্ষ সত্যের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাসী, যদিও যুক্তি প্রমাণে তা সব সময় প্রতিষ্ঠা করা যায় না, – এমনকি আদিম মানুষের অভিজ্ঞতাতেও তা প্রতিফলিত। আমরা সত্যের ওপর আরোপ করি এক ধরণের অতিমানবীয় বিষয়মুখিতা। তিনি জোর দিয়েই বলেছেন বাস্তবতা আমাদের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কবিহীন এবং আমাদের অভিজ্ঞতা অনপেক্ষ, যদিও আমরা বলতে পারি না এর প্রকৃত অর্থ কি। এমন কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাতেও এটি আমরা উপলব্ধি করতে পারি– যেমন আলাপ কক্ষে যে টেবিলটি রয়েছে, তার অস্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন না থাকলেও, থাকবে।

অন্যদিকে বাস্তবতার প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সার কথা হল মনুষ্য অভিজ্ঞতা বহির্ভুত বাস্তবতা অলীকের মত- এর প্রকৃতি অজ্ঞেয়, এবং এ ধরণের বাস্তবতা থাকুক বা নাই থাকুক কি এসে যায়। তাঁর মতে সত্য প্রকাশিত হয় মানবিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। সুতরাং কবির 'বাস্তবতা, সত্য ও জগৎ' অন্তর্নিহিতভাবে মনুষ্য পর্যবেক্ষণ নির্ভর। কবির মতে সত্য মহাবৈশ্বিক সত্তার সাথে একত্রিত একটি সমগ্র, এবং তা অবশ্যই মানবিক। যে সত্যকে আমরা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে চিহ্নিত করি এবং যা কেবল যুক্তির প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পৌঁছান যায়, সেটিও কিন্তু মানবিক। বিজ্ঞানে ব্যক্তিগত মনের সীমাবদ্ধতা অপনয়ন করে আমরা অগ্রসর হই একটি শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে; এভাবে সত্য অনুধাবনে উপনীত হতে পারি, যা রয়েছে সার্বজনীন মানব মননে। ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল ব্যক্তি মনের বাইরে হয়তো এটি ছিল, কিন্তু সার্বজনীন মনের বাইরে কখনও ছিল না। কবির ভাষায়, 'যে টেবিলটি আমি দেখছি তা একই ধরণের চেতনা দ্বারা অনুভবনীয়, যে চেতনা আমার রয়েছে।' বস্তু প্রত্যক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন যে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে টেবিলটি আমরা কঠিন বস্তু রূপে দেখছি তা কেবল 'প্রতীয়মান' এবং মনুষ্য মন যে বস্তুটিকে টেবিল বলে অনুভব করছে তার অস্তিত্ব থাকত না যদি মন বলে কিছু না থাকে। একই সাথে এ কথাও স্বীকার্য যে বস্তুটির চুড়ান্ত ভৌত বাস্তবতা তো বিজ্ঞানের চোখে

বহুসংখ্যক পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘূর্ণ্যমান কণিকার সমষ্টি বই তো কিছু নয়। সত্য অনুধাবনে দুটি পরস্পর বিরোধী সত্তা ক্রিয়াশীল – একটি হল সার্বজনীন মনুষ্য মন এবং অন্যটি হল একই মন যা ব্যক্তি বিশেষে বন্দী। বিজ্ঞানে, দর্শনে .. এই দুই সত্তার মধ্যে মিলন ঘটানোর শাশ্বত প্রক্রিয়া অবিরত চলতে থাকে। মোট কথা হল মানবতার সাথে সম্পর্কহীন এমন কোন সত্য যদি থেকেও থাকে, সে সত্য মানুষের কাছে না থাকার সমতুল্য। রবীন্দনাথ তার সার কথাটি উচ্চারণ করেছেন এভাবে ঃ '*যদি এমন কিছু সত্য থাকে যা মনুষ্য মনের কাছে অনুভুতিময়* (sensuous) *বা যৌক্তিক সম্পর্ক হিসেবে ধরা না পড়ে, - তাহলে এ ধরণের সত্যের কোন তাৎপর্য আমাদের কাছে বহন করে না, যতক্ষণ আমরা মানুষ রয়েছি।*

মনুষ্য প্রত্যক্ষণ নির্ভর সত্যের কথাই কবি তাঁর কবিতার বাণী দিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন (১০) ঃ

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে–
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'
সুন্দর হল সে।

তুমি বলবে এ যে তত্ত্বকথা, এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব এ সত্য,
তাই এ কাব্য।

কবির সাথে আইনস্টাইনের আর একটি সাক্ষাৎ হয় ১৯৩০ সালের ১৯শে আগস্ট তারিখে যা ইতোপুর্বেই বলা হয়েছে। এ সময়ের আলাপচারিতায় স্থান পেয়েছেল জার্মানীর যুব আন্দোলন, সমকালীন বিশ্ব রাজনীতি .. ..। আলোচনার আরম্ভটি হয়েছিল 'দৈবাৎ ও পুর্বনির্দেশ্যবাদ' (chance and predetermination) – এদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে, পরে তা গড়ায় পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সঙ্গীত নিয়ে এক চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর আলোচনায়।

কবিগুরু আইনস্টাইনের সাথে সাক্ষাতের আগে সেদিনই ড. মেন্ডেলের সাথে আধুনিক পরমাণু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সম্পর্কে আলোচনার সুত্র ধরে কথোপকথনের সুচনাতেই বিজ্ঞানীর কাছে জানতে চাইলেন,

> নতুন গাণিতিক আবিষ্কার যা আমাদের বলছে যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণুর জগতে দৈবাতের একটি ভুমিকা রয়েছে– এ বিষয় নিয়ে আজকে ড. মেন্ডেলের সাথে আলাচনা করছিলাম। অস্তিত্বের নাটক নাকি চরিত্রের দিক থেকে পরম পুর্ব নির্দিষ্ট নয়।

বিজ্ঞানী জবাবে বলেছিলেন যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রবণতা যদিও সে দিকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তবে এখনও বলা যাচ্ছে না যে 'কার্য-কারণাতা'কে অন্তিম বিদায় জানাবার সময় আসন্ন।

কার্য-কারণতা ও দৈবাৎ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সার কথা ছিল ঃ মনে হয় কার্য-কারণতা নয়, সুশৃঙ্খল মহাবিশ্ব গঠনে অন্য কোন বল যেন ক্রিয়াশীল। আরও মনে হয় যেন প্রকৃতির গভীরতায় 'দ্বৈততার' অস্তিত্ব বিদ্যমান। কবি এর পর প্রসঙ্গ টেনেছেন যে মানুষের মনস্তত্ত্বেও এর সমান্তরলতা লক্ষ্য করা যায়। মনুষ্য কামনাসক্তি ও অভিলাষ অত্যন্ত অবাধ্য বা উচ্ছৃঙ্খল, কিন্তু মানুষের চরিত্র এই বিশৃঙ্খল উপাদানগলোকে স্তিমিত করে একটি ঐকতান-সামগ্র রচনা করে। কবি বিজ্ঞানীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন পার্থিব জগতেও এ ধরণের ঘটনাদি ঘটে কি না; এ পার্থিব জগতের মৌসমুহও কি অবাধ্য এবং এক ধরণের তাড়নার দ্বারা গতিময় হয়। ভৌত জগতে এমন কোন নীতি রয়েছে কি না যা এদের প্রভাব বিস্তার করে একটি সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম।

আইনস্টাইন প্রত্যুত্তরে যা বলেছিলেন তার সারমর্ম হল– সাধারণভাবে উচ্চতর স্তরে ভৌত বাস্তবতার এই শৃঙ্খলা বুঝবার চেষ্টা করা হয়। সেখানে শৃঙ্খলা বিদ্যমান যেখানে বৃহৎ উপাদানগুলো একত্রিত হয় এবং অস্তিত্বের দিক নির্দেশনা দেয়; কিন্তু ক্ষুদ্র উপাদান-স্তরে এই শৃঙ্খলা প্রত্যক্ষণীয় নয়। বৃহৎ জগতে সুশৃঙ্খলা অন্যদিকে আণুবীক্ষনিক জগতে আপাত বিশৃঙ্খলা ও নিশ্চযতার স্থানে সম্ভাব্যতার দৃঢ় অবস্থান – এই দ্বৈততা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন যে আধুনিক পদার্থবিদ্যা কখনও বলে না যে এরা পরস্পর বিরোধী নয়। মেঘ ও মেঘে জলকণার অস্তিত্বের উদাহরণ টেনে বলেছেন যে দুর থেকে দেখা মেঘকে অবিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়, কিন্তু কাছ থেকে এই মেঘকে মনে হবে বিশৃঙ্খল জলবিন্দুর ইতস্ততঃ সমষ্টি। জড় জগতের মৌলসমুহ সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল যে এদের মধ্যেও এক ধরণের সংখ্যায়নিক শৃঙ্খলা রয়েছে; যেমন রেডিয়ামের উপাদানগুলো, বর্তমানেই হোক বা আগামীতেই হোক, সব সময় বিশেষ শৃঙ্খলা বজায় রাখে, যেমনটি তারা সব সময় বজায় রেখে এসেছে। কার্য-কারণ সম্পর্কে তাঁর শেষ বক্তব্য ছিল যে আমরা যা কিছুই করি না কেন, এর পেছনে রয়েছে কায-কারণতা; এটা অবশ্য ঠিক যে এর অস্তিত্ব সব সময় অনুধাবন করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন যে মানুষের কার্যকলাপেও রয়েছে এক ধরণের স্থিতিস্থাপকতার উপাদান। মানুষের ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তিতে কিছু স্বাধীনতার অবশ্য প্রয়োজন, তা ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে হলেও। এর পর তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের উপমা টেনে বলেছিলেন যে ভারতীয় সঙ্গীত নিগুড় নিয়মে বাঁধা হলেও গায়ক ও সঙ্গীতকার কিছু স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে– পশ্চিমী সঙ্গীতের মত অত দৃঢ় ও অনড় পদ্ধতি নয়। এর পরই তাঁরা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সঙ্গীত নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠেন। এ আলোচনা অন্য একটি প্রবন্ধের চিত্তাকর্ষক বিষয় হতে পারে।

সত্যের স্বরূপ বা বাস্তবাতার প্রকৃতি নিয়ে কবি ও বিজ্ঞানীর মধ্যে আলোচনা এখনও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা উদাহরণ স্বরূপ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রসায়নবিদ ইলিয়া প্রিগোজিনের (Ilya Prigogine) মন্তব্য তুলে ধরছি (১):

> The question of meaning of reality was the central subject of a fascinating dialogue between Einstein and Tagore. Einstein emphasized that the science had to be independent of the existence of any observer. This led him to deny the reality of time as irreversibility, as evolution. On the contrary Tagore maintained

that even if absolute truth could exist, it would be inaccessible to the human mind. Curiously enough the present evolution of science is running in the direction stated by the great poet.

পরিশিষ্টে আইনস্টাইন – রবীন্দ্র নাথের আলাপচারিতার বঙ্গানুবাদ প্রদান করা হল

পরিশিষ্ট ১ ঃ সাক্ষাৎকার : ১৪ই জুলাই, ১৯৩০

বাস্তবতার প্রকৃতি (Nature of Reality)

রবীন্দ্রনাথ ঃ আপনি গণিতের সাহয্যে দুটি প্রাচীনতম সত্তা স্থান ও কালের রহস্য উদ্ধারের পেছনে ছুটছেন, আর আমি এদেশে বক্তৃতা দিয়ে বক্তৃতা দিয়ে চলেছি মানুষের 'শাশ্বত জগৎ অর্থাৎ বাস্তবতার মহাবিশ্বে'র ওপর।

আইনস্টাইন ঃ জগৎ বিচ্ছিন্ন কোন ঐশ্বরিক সত্তায় আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন?

রবীন্দ্রনাথ ঃ বিচ্ছিন্ন কোন সত্তায় নয়। মানুষের অসীম ব্যক্তিত্ব মহাবিশ্বকে অনুধাবন করে। এমন কোন বস্তু নেই যা মনুষ্য ব্যক্তিত্ব কোন না কোন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারে। এ থেকে প্রমাণিত হয় য়ে মহাবিশ্ব সংশ্লিষ্ট সত্য হল মানবীয় সত্য। একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যের মাধ্যমে আমি এর ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছি। জড় পদার্থ প্রোটন ও ইলেকট্রন সমষ্টি দিয়ে তৈরী, তবে এদের মধ্যে রয়েছে শুন্যতা; জড়কে কিন্তু মনে হতে পারে হয় কঠিন বস্তু রূপে স্থানিক কোন সংযোগ ব্যতিরেকেই, যা স্বতন্ত্র ইলেকট্রন ও প্রোটনসমূহকে একত্রিত করেছে। একই সাদৃশ্য টেনে বলা যায় যে মনুষ্যত্ব হল স্বতন্ত্র ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি, কিন্তু তবুও এদের মধ্যে রয়েছে মনুষ্য সম্পর্কবোধের পারস্পরিক যোগাযোগ, যা থেকে উদ্ভুত হয় মনুষ্য জগতের জীবন্ত ঐক্য। স্বতন্ত্র সত্তা হিসেড়্গ আমরা সমগ্র মহাবিশ্বের সাথে যুক্ত হয়ে আছি, একই ভাবে – এটি হল মানবীয় মহাবিশ্ব।

আইনস্টাইন ঃ মহাবিশ্বের স্বরূপ নিয়ে দুটি ধারণা রয়েছে– জগৎ হল একটি একক সত্তা যা মনুষ্যত্বের ওপর নির্ভরশীল, এবং অন্যটি হল জগৎ একটি বাস্তবতা যা মনুষ্য উপাদানের ওপর নির্ভর করে না।

রবীন্দ্রনাথ ঃ যখন আমাদের মহাবিশ্ব মানুষের সাথে ঐকতানে বিরাজ করে তখন শাশ্বত, যাকে আমরা সত্য বলে জানি, হয়ে দাঁড়ায় সৌন্দর্য, আমাদের অনুভুতিতে।

আইনস্টাইন ঃ এটি মহাবিশ্ব সম্পর্কে পরিশুদ্ধভাবেই মানবীয় ধারণা।

রবীন্দ্রনাথ ঃ এ ছাড়া অন্য কোন ধারণা থাকতে পারে না। এই জগৎ বস্তুত মানবীয় জগৎ– এর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিও হল বিজ্ঞানী মানুষের দৃষ্টি। সুতরাং, আমাদের ছাড়া বিশ্ব জগতের অস্তিত্ব নেই; এটি হল আপেক্ষিক জগৎ, যার বাস্তবতা আমাদের চেতনার ওপর নির্ভরশীল । যুক্তি ও আনন্দভোগের কতিপয় প্রামাণ্য রয়েছে যার মাধ্যমে সত্য

উদ্ঘাটিত হয়; এই সত্যই হল শাশ্বত মানুষের প্রামাণ্য যার অভিজ্ঞতা পুঞ্জীভুত হচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই।

আইনস্টাইন ঃ এ তো হল মনুষ্য সত্তার উপলব্ধি।

রবীন্দ্রনাথ ঃ হ্যাঁ, এক শাশ্বত সত্তা। আমাদের এটি উপলব্ধি করতে হবে আমাদের আবেগ ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে। আমরা মহামানবকে এভাবেই উপলব্ধি করি, আমাদের সীমাবদ্ধতার ভেতর দিয়ে, যে মহামানবের কোন স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধতা নেই; এটি হল সত্যের নৈর্ব্যাক্তিক মানবীয় জগৎ। ধর্ম এসব সত্যের উপলব্ধি করে, এবং আমাদের গভীরতম কামনার সাথে সংযোগ স্থাপন করে; সত্য সম্পর্কে আমাদের ব্যক্তি চেতনা বিশ্বজনীন তাৎপর্য অর্জন করে থাকে। ধর্ম সত্যের ওপর মুল্যবোধ আরোপ করে থাকে, এবং আমরা জানি যে এর সাথে আমাদের স্ব ঐকতানের মিলনের মধ্য দিয়ে এই সত্য মঙ্গলময় বলে প্রতিভাত হয়।

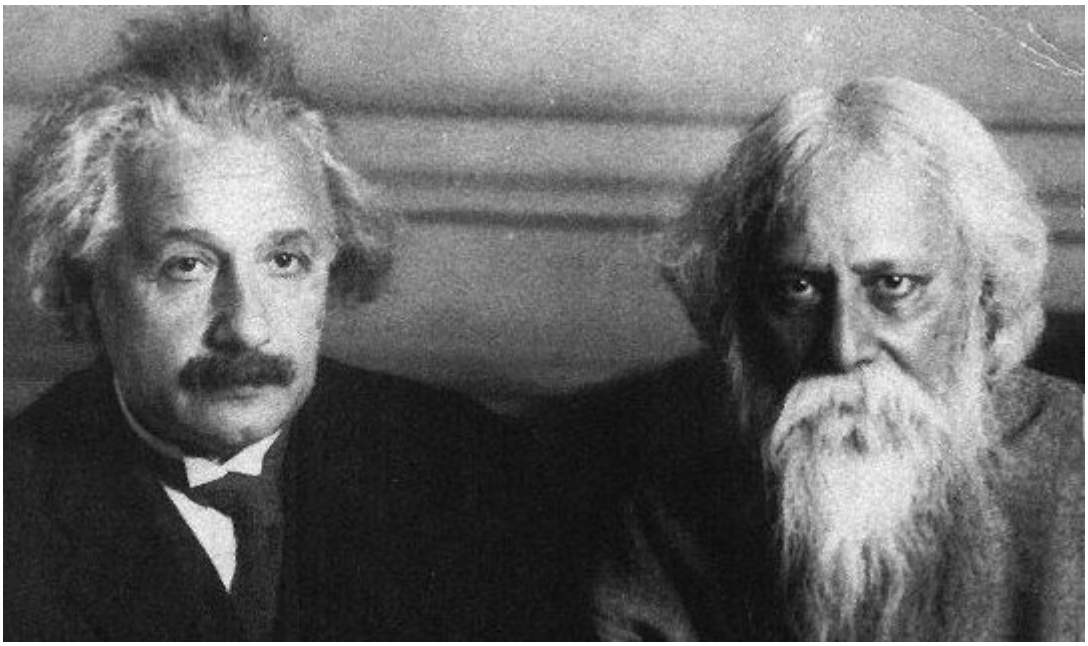

আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ, ১৪ই জুলাই, ১৯৩০

আইনস্টাইন ঃ সত্য তাহলে, অথবা সৌন্দর্য মানুষের অস্তিত্ব অনপেক্ষ নয় ?

রবীন্দ্রনাথ ঃ না। আমি তা বলি না।

আইনস্টাইন ঃ মানুষের অস্তিত্ব যদি নাই থাকে, তাহলে বেলভেদরের অ্যাপোলোর সৌন্দর্যের অস্তিত্ব থাকবে না ?

রবীন্দ্রনাথ ঃ না।

আইনস্টাইন ঃ সৌন্দর্য সম্স্লর্কে আপনার এ ধারণার সাথে আমি এক মত, কিন্তু সত্য সম্স্লর্কে এ ধারণার সাথে একমত নই।

রবীন্দ্রনাথ ঃ কেন নন ? সত্য তো মানুষের ভেতর দিয়েই প্রতিভাত হয়।

আইনস্টাইন ঃ আমার ধারণা যে সঠিক- তা হয়তো আমি প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু এটি আমার ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ ঃ সর্বাঙ্গ সুন্দর ঐকতানের আদর্শের মধ্যেই তো সৌন্দর্যের অস্তিত্ব – এবং যা কিনা বিশ্বজনীন চেতনাতেও (Universal being) বিদ্যমান। সত্য হল বিশ্বজনীন মনের সর্বাঙ্গ সুন্দর অনুধাবন। আমরা স্বতন্ত্র ব্যক্তিবর্গ আমাদের ভুল ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে, আমাদের পুঞ্জীভুত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, আমাদের উদ্ভাসিত আলোকিত চেতনার মধ্য দিয়ে এই সত্যের সমীপবর্তী হতে থাকি। এ ছাড়া আমরা কি ভাবে সত্যকে জানব?

আইনস্টাইন ঃ আমি প্রমাণ করতে পারব না যে 'বৈজ্ঞানিক সত্যকে' সত্য হিসেবে উপলব্ধি করতে হবে যা কি না মনুষ্য অস্তিত্ব অনপেক্ষ; কিন্তু এটি আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। যেমন উদাহরণ স্বরূপ, জ্যামিতিতে পিথাগোরীয় উপপাদ্যের বক্তব্য, আংশিক সত্য হলেও, মানুষের অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়। সে যাই হোক, মনুষ্য অনপেক্ষ বাস্তবতা যদি থেকে থাকে, তাহলে এই বাস্তবতার সাপেক্ষে একটি সত্যও থাকবে; এবং একই ভাবে বলা যায় যে প্রথমটির অস্বীকারকরণ শেষেরটির অস্তিত্বেরও নাস্তিকরণ ঘটাবে।[১]

রবীন্দ্রনাথ ঃ সত্য, যা বিশ্বজনীন চেতনার সাথে একীভুত, অবশ্য অপরিহার্যভাবে মানবীয়; অন্যথায়, আমরা ব্যক্তি মানুষেরা যা কিছু সঠিক বলে অনুধাবন করি, তাকে কখনও সত্য বলে অভিহিত করা যাবে না; অন্তত যে সত্যকে আমরা বৈজ্ঞানিক বলে আখ্যা দিই, এবং যেখানে কেবল যৌক্তিক প্রক্রিয়া বা অন্য কথায় একটি সুশৃংখল চিন্তা-তন্ত্রের মধ্য দিয়েই উপনীত হওয়া যায়, কারণ এ সবই সম্স্লুর্ণ মানবিক। ভারতীয় দর্শন বলে ব্রহ্ম নামে এক পরম সত্য বিদ্যমান যা বিচ্ছিন্ন মানুষের মনের অনুভুতির বাইরে, মনুষ্য জ্ঞানাতীত ও বর্ণনাতীত; এই পরম সত্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব কেবল ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে বিসর্জন দিয়ে– নিজেকে ঐ সত্তার অসীমতায় লীন করে দিয়ে। কিন্তু এ ধরণের সত্যানুভুতি বিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। সত্যের প্রকৃতি, যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, কিন্তু আভাসিক বা প্রতীয়মান, অর্থাৎ মানুষের মনে যে সত্য রূপে ধরা দেয়; কাজেই এ সত্য মানবধর্মী, এবং একে বলা যেতে পারে 'মায়া' বা অধ্যাস।
আইনস্টাইন ঃ সুতরাং আপনার ধারণা ক্রমে, যাকে বলা যেতে পারে ভারতীয়, এটি কোন ব্যক্তির অধ্যাস নয়, সমগ্র মানব জাতির।[২]

১। এখানে উদ্ধৃত আইনস্টাইনের বক্তব্যের সাথে অন্য একটি বক্তব্যেও মধ্যে পার্থক্য দেখা গেছে। অন্য বক্তব্যটিতে আইনস্টাইন বলছেন ঃ 'আমি প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু আমি পিথাগোরীয় যুক্তিতে বিশ্বাস করি, যে সত্য হল মনুষ্য অস্তিত্ব অনপেক্ষ। এটি হল সন্ততির যুক্তি সম্পর্কিত সমস্যা।' (I cannot prove, but I believe in the Pythagorean argument, that the truth is independent of human beings. It is the problem of the logic of continuity)

২। অন্য ভার্সন মতে আইনস্টাইন বলছেন ঃ ' ব্যক্তি মানুষের মাায়া নয়, সমগ্র মনুষ্য প্রজাতির।' (It is no illusion of the individual, but of te species)। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলছেন ঃ 'প্রজাতিও একত্বের ও মানবতার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সমগ্র মানবীয় মন সত্যকে উপলব্ধি

রবীন্দ্রনাথ ঃ বিজ্ঞানেও তো আমরা আমাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র মনের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতাগুলোকে অপনয়ন করে শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হই; এভাবেই আমরা সেই সত্যের অনুভূতিতে উপনীত হই যা সার্বজনীন মানুষের মনে বিদ্যমান।

আইনস্টাইন ঃ কিন্তু সমস্যাটি শুরু হয়, সত্য কি আমদের চেতনা নিরপেক্ষ - এ প্রশ্নের মুখোমুখী হই আমরা যখন।

রবীন্দ্রনাথ ঃ যাকে আমরা সত্য বলে আখ্যায়িত করছি তা অন্তর্লীন হয়ে আছে বাস্তবতার বস্তুতান্ত্রিকতা ও আত্মমুখীতা বৈশিষ্ট্যের যৌক্তিক ঐকতানের মধ্যে; উভয়ই সেই অতি-ব্যক্তিক মানবের (super-personal man) মধ্যে বিরাজমান।

আইনস্টাইন ঃ এমন কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও, আমরা বাধ্য হই আমরা যে সব জিনিস ব্যবহার করি তার ওপর মনুষ্য অনির্ভরশীল এক বাস্তবতা আরোপ করতে। আমরা এটি করে থাকি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাকে যৌক্তকভাবে সংযুক্ত করতে। উদাহরণ স্বরূপ, এই ঘরে কেউ যদি নাও থাকে, তাহলেও এই টেবিলটি যেখানে আছে সেখানেই থাকবে।[৩]

রবীন্দ্রনাথ ঃ হ্যাঁ, এটি ব্যক্তি মনের বাইরে থাকেবে ঠিকই, কিন্তু মহাবৈশ্বিক মনের (universal mind) বাইরে থাকেবে না। টেবিলটি, যা আমি প্রত্যক্ষ করছি, একই ধরণের চেতনা দ্বারা অনুধাবনীয়, যা আমার রয়েছে।

আইনস্টাইন ঃ লোকোত্তর সত্যের অস্তিত্ব আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ব্যাখ্যা বা প্রমাণ করা যাবে না, কিন্তু এটি হল এক ধরণের বিশ্বাস যার ঘাটতি নেই, এমন কি আদিম মানুষের মধ্যেও। একটি অতিমানবীয় বিষয়মুখিতার (superhuman objectivity) ওপর আমরা সত্যকে আরোপ করে থাকি; আমাদের জন্যএটি অত্যাবশ্যক, এই বাস্তবতা- যা আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের অভিজ্ঞতা এবং মন অনপেক্ষ– যদিও আমরা বলতে পারি না এর অর্থ কী।

করে; ভারতীয় মনন ও ইউরোপীয় মননও একটি অভিন্ন উপলব্ধিতে মিলিত হয়।" (The species also belongs to a unity, to humanity. Therefore human mind realizes truth; the Indian and the European mind meet in a common realization.) । এর পর আইনস্টাইন বলছেন ঃ 'প্রজাতি শব্দটি জার্মান ভাষায় সমগ্র মনুষ্য জাতিকে বুঝায়; সত্যি কথা ভরতে কি, বানর ও ব্যাঙ – এরাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সমস্যা হল সত্য আমাদের চেতনা অনির্ভর কি না।' (The word species is used in German for all human beings; as a matter of fact, even the apes and frogs would belong to it. The problem is whether truth is independent of our consciousness.)

৩। অন্য ভার্সন মতে আইনস্টাইন বলছেন ঃ ' এই ঘরে কেউ যদি নাও থাকে, তাহলেও এই টেবিলটি যেখানে আছে সব সময় সেখানেই থাকবে, কিন্তু আপনার দৃষ্টিভঙ্গীতে এটি অসিদ্ধ, কারণ আমরা ব্যখ্যা করতে পারি না আমাদের অনপেক্ষ টেবিলের আস্তিত্বের অর্থ কী ? লোকোত্তর সত্যের অস্তিত্ব আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ব্যাখ্যা বা প্রমাণ করা যাবে না, কিন্তু এটি হল এক ধরণের বিশ্বাস যার ঘাটতি নেই, এমন কি আদিম মানুষের মধ্যেও। একটি অতিমানবীয় বিষয়মুখিতার (superhuman objectivity) ওপর আমরা সত্যকে আরোপ করে থাকি; আমাদের জন্যএটি অত্যাবশ্যক, এই বাস্তবতা- যা আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের অভিজ্ঞতা এবং মন অনপেক্ষ– যদিও আমরা বলতে পারি না এর অর্থ কী।' এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ 'সে যাই হোক, সম্পূর্ণভাবে মনুষ্য সম্পর্কশূন্য কোন সত্য যদি থেকেও থাকে, তাহলে আমাদের কাছে এটির অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবেই 'নাস্তির' সামিল।'

রবীন্দ্রনাথ ঃ বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে টেবিলটির কঠিন রূপ 'প্রতীয়মান মাত্র' (appearance) সুতরাং যেটিকে মনুষ্য মন টেবিল রূপে জ্ঞান করে, তার অস্তিত্ব নাস্তিতে পরিণত হয়, যদি সেই মনুষ্য মনটিই অনুপস্থিত থাকে। একই সাথে আমাদের অবশ্য মানতে হবে যে ঐ বস্তুটির চূড়ান্ত ভৌত বাস্তবতা হল অসংখ্য বিচ্ছিন্ন ঘূর্ণ্যমান বৈদ্যুতিক বলের কেন্দ্রসমুহ, যার অস্তিত্বও মনুষ্য মন সঞ্জাত। সত্যের অনুধাবনে মহাবৈশ্বিক মন ও সান্ত ব্যক্তিতে আবদ্ধ একই মনের মধ্যে রয়েছে চিরন্তন বিরোধ। চির চলমান সমঝোতার প্রক্রিয়া চালিত হচ্ছে আমাদের বিজ্ঞানে, দর্শনে, এবং আমাদের নীতিশাস্ত্রে। সে যাই হোক, সম্পূর্ণভাবে মনুষ্য সম্পর্কশূন্য কোন সত্য যদি থেকেও থাকে, তাহলে আমাদের কাছে এটির অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবেই 'নাস্তির' সামিল। এটি বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মনের মধ্যে ঘটমান আনুক্রমিক ঘটনাগুলো স্থানে ঘটে না, ঘটে কেবলমাত্র কালে, ঠিক যেমন সঙ্গীতে সৃষ্ট স্বরধ্বনির অনুক্রম (ংবয়ঁবহপব ড়ভ হড়ঃবং রহ সঁংরপ)। এ ধরণের মনের কাছে এ ধরণের 'বাস্তবতার ধারণা' হল সঙ্গীতময় বাস্তবতার অনুরূপ; সেখানে পিথাগোরীয় জ্যামিতির কোন তাৎপর্য থাকে না। এই কাগজ খণ্ডটির বাস্তবতা রয়েছে– কিন্তু তা সীমাহীনভাবে সাহিত্যের বাস্তবতা থেকে স্বতন্ত্র। একটি মথ যে ধরণের মন ধারণ করে, তার কাছে কাগজ খণ্ডটি খাদ্য বস্তু– সেই মনের কাছে সাহিত্যের একেবারেই কোন অস্তিত্ব নেই; অথচ মানুষের মনের কাছে সাহিত্যের মুল্য অনেক বেশী কাগজ খণ্ডটির তুলনায়। একই ভাবে বলা যায়, যদি এমন কিছু সত্য থাকে যা মনুষ্য মনের কাছে অনুভুতিময় (sensuous) বা যৌক্তিক সম্পর্ক হিসেবে ধরা না পড়ে, - তাহলে এ ধরণের সত্যের কোন তাৎপর্য আমাদের কাছে বহন করে না, যতক্ষণ আমরা মানুষ রয়েছি।

আইনস্টাইন ঃ তাহলে আমি আপনার চাইতে বেশী ধার্মিক।

রবীন্দ্রনাথ ঃ ব্যক্তি আমির অস্তিত্বে অতি-ব্যক্তিক মানবের (super-personal man) ও বিশ্বজনীন শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনানাই আমার ধর্ম। এটিই ছিল আমার হিব্বার্ট বক্তৃতার বিষয়, যাকে আমি অভিহিত করেছি "মানুষের ধর্ম" নামে।[*] (১১,১২)

<u>পরিশিষ্ট ২</u> ঃ সাক্ষাৎকার : ১৯শে আগস্ট, ১৯৩০

<u>দৈবাৎ ও পুর্বনির্দেশ্যবাদ (Chance and Determinism)</u>

রবীন্দ্রনাথ ঃ নতুন গাণিতিক আবিষ্কার যা আমাদের বলছে যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণুর জগতে দৈবাতের একটি ভুমিকা রয়েছে– এ বিষয় নিয়ে আজকে ড. মেন্ডেলের সাথে আলাচনা করছিলাম। অস্তিত্বের নাটক নাকি চরিত্রের দিক থেকে পরম পুর্ব নির্দিষ্ট নয়।

[*] কবি হিব্বার্ট বক্তৃতার বিষয় বস্তু হিসেবে 'The Religion of Man' নামে ১৯৩০ সালের মে মাসের ১৯, ২১, ও ১৬ তারিখে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই তিনটি বক্তৃতাই সংকলন আকারে The Religion of Man শিরোনামে গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। গ্রন্থটির ভূমিকায় বলেছিলেন ঃ '… … The fact that one theme runs through all only proves to me that the Religion of Man has been growing within my mind as a religious experience and not merely as a philosophical subject. In fact, a very large portion of my writings, beginning from the earlier products of my immature youth down to the present time, carry an almost continuous trace of the history of this growth. Today I am made conscious of the fact that the works I have started and the words that I have uttered are deeply linked by a unity of inspiration whose proper definition has often remained unrevealed to me.'

আইনস্টাইন ঃ বৈজ্ঞানিক তথ্য, যদিও এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে, কিন্তু কার্য-কারণতাকে চির বিদায় জানায় নি।

রবীন্দ্রনাথ ঃ হয়তো তা নয়, কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় মৌলসমুহে (elements) কার্য-কারণতা ক্রিয়াশীল নয়, অন্য কোন শক্তি এদের মধ্যে রয়েছে যা একটি সুশৃঙ্খল মহাবিশ্ব গড়ে তুলেছে।

আইনস্টাইন ঃ উচ্চতর তলে এই শৃঙ্খলার ধরণ কেমন তা অনুধাবনের প্রয়াস চলছে। সেখানে শৃঙ্খলা রয়েছে, যেখানে স্থুল উপদানগুলো সম্মিলিত হচ্ছে এবং অস্তিত্বের নির্দেশ দিচ্ছে; কিন্তু ক্ষুদ্র উপাদানগুলোতে এই শৃঙ্খলা প্রত্যক্ষণীয় নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঃ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই দ্বৈততা রয়েছে অস্তিত্বের গভীরতায়; এই পরস্স্পর বিরোধিতা হল মুক্ত উদ্দীপন এবং সুনির্দেশিত ইচ্ছার যা এর ওপর ক্রিয়া করে, এবং জড়ের একটি সুশৃঙ্খল পরিকল্পনার উন্মেষ ঘটায়।

আইনস্টাইন ঃ আধুনিক পদার্থবিদ্যা বলে না যে তারা পরস্স্পর বিরোধী। দুর থেকে মেঘপুঞ্জকে একটি একক সত্তা বলে মনে হয়, আপনি যদি কাছ থেকে এদের প্রত্যক্ষ করেন, তাহলে এদেরকে মনে হবে ইতস্ততঃ বিশৃঙ্খল জলবিন্দুর সমাহার।

রবীন্দ্রনাথ ঃ মানবীয় মনস্তত্ত্বেও আমি এ ধরণের সমান্তরালতা দেখতে পাই। আমাদের কামনা ও বাসনা অবাধ্য, কিন্তু আমাদের অন্তর্চরিত্র এ সব উগ্র উপাদানকে স্তিমিত করে একটি ঐকতানীয় সমগ্র (a harmonious whole) রচনা করে। পর্থিব জগতেও কি এ ধরণের কোন কিছু ঘটে থাকে ? মৌলগুলো কি বিদ্রোহী, স্বতন্ত্র উদ্দীপনে গতিশীল হয়ে ওঠে ? পর্থিব জগতে কি এমন কোন নীতি বিদ্যমান যা এদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং এদেরকে একটি সুশৃঙ্খল সংগঠনে স্থাপন করে ?

আইনস্টাইন ঃ এমন কি মৌলসমুহও সংখ্যায়নিক শৃঙ্খলাহীন নয়; রেডিয়ামের মৌলসমুহও, আগামীতেও বর্তমানেই হোক বা আগামীতেই হোক, সব সময় বিশেষ শৃঙ্খলা বজায় রাখে, যেমনটি তারা সব সময় বজায় রেখে এসেছে। মৌলসমুহের মধ্যে, তাহলে, একটি সংখ্যায়নিক শৃঙ্খলা বিদ্যমান।

রবীন্দ্রনাথ ঃ তা না হলে, অস্তিত্বের নাটক হয়ে দাঁড়াবে অতীব শৃঙ্খলাহীন ও এলোমেলো। এটি হল দৈবাৎ ও নির্ধারণের সতত ঐকতান যা একে চিরন্তনভাবে নতুন ও জীবন্ত করে তোলে।

আইনস্টাইন ঃ আমার বিশ্বাস যে আমরা যা কিছুই করি অথবা যা কিছুর জন্য বাঁচি এর পেছনে রয়েছে কায-কারণতা; এটি মঙ্গলজনক যে এর অস্তিত্ব সব সময় আমরা অনুধাবন করতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথ ঃ মানবীয় কার্যকলাপেও রয়েছে এক ধরণের স্থিতিস্থাপকতার উপাদান, ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে হলেও কিয়ৎ পরিমানে স্বাধীনতা, আমাদের ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তির জন্য প্রয়োজন। এটি হল ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতির অনুরূপ, যা পশ্চিমী সঙ্গীতের মত অত দৃঢ় ও অনড় পদ্ধতি নয়। আমাদের সুরকারেরা এক ধরণের সুনির্দ্দিষ্ট খসরা-চিত্র বা বর্হিরেখা এঁকে দেন, অর্থাৎ একটি সুরের জগৎ এবং ছন্দোবদ্ধ ব্যবস্থা নির্মাণ করে দেন, আর সেই পরিসীমার মধ্যে থেকেও আমাদের শিল্পীরা সৃষ্টিশীলতার বিকাশ ঘটান। তিনি একাধারে ঐ বিশেষ সুরের নিয়ম নীতিগুলোর সাথে একাত্মতা বোধ করবেন, আবার একই সাথে সকল নির্দ্দেশ মাথায় রেখে নিজের সঙ্গীতময় অনুভুতিগুলোর স্বতঃপ্রণোদিত প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। আমরা সুরকারের প্রতিভার প্রশংসা করি সঙ্গীতের সৃষ্টিশীলতার ভিত তৈরীর জন্য, ও সেই সাথে এর অধিকাঠামোর চমৎকার নির্শাণশৈলীর কারণে। কিন্তু আমরা এও আশা করব যেন সঙ্গীত শিল্পীর মাঝে স্বকীয় দক্ষতা যা সঙ্গীতময় ভাস্বত্মতা ও কারুকার্যতা সৃষ্টিতে সক্ষম। সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমরা অস্তিত্বের কেন্দ্রীণ নিয়মগুলো মেনে চলি, কিন্তু আমরা যদি নিয়মের বাত্যায় তারিত না হই, তাহলে আমাদের ব্যক্তিত্বের সীমার মধ্যে আমরা যথেষ্ট স্বাধীনতা উপভোগ করি যা আমাদের পরিপুর্ণ নিজ-অনুভুতিগুলোকে বাঙময় করে তোলে।

২৪/১১/০৫

<u>প্রাসঙ্গিকী</u>

১। *রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান*, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স

২। Clerk Maxwell's Influence on the Evolution of the Idea of Physical Reality, The World As I See It, p 60, A. Einstein, 1933)

৩। Phys. Zeitschr, 17, p101, 1916

৪। Reply to Criticism, Albert Einstein, Albert Einstein : Philosopher Scientist, The Library of Living Philosophers, Volume VII, Ed. Paul Arthur Schilpp, The Library of Living Philosophers, Inc., Evanston, Illinois, 1949)|

৫। On the method of Theoretical physics, The world as I see it, Albert Einstein, 1933)

৬। ঐ

৭। Geometry and Experience, Address to the Prussian Academy of Sciences, Berlin, January 27, 1921)|

৮। Autobiographical Notes, Albert Einstein, Albert Einstein: Philosopher-Scientist, The Library of Living Philosophers, Inc., Evaston, Illinois, 1949)

৯। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল ঃ 'আইনস্টাইন এবং রবীন্দ্রনাথ গভীর সত্যের সন্ধানে ঃ বিজ্ঞানী ও কবির ভাব বিনিময়– মনুষ্যত্ব সম্পর্কহীন সত্যের অস্তিত্বের সম্ভাবনা' (Einstein and Tagore Plumb the truth: Scientist and Poet Exchange Thoughts on the possibility of its Existence without relation to humanity), Dimitri Marianoff, New York Times Magazine, August 10, 1930.

১০। আমি, *শ্যামলী*, (১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩)

১১। রবীন্দ্রনাথ লিখিত ' ' এর পরিশিষ্টে প্রকাশিত 'আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের এই কথোপকথনের ভাবানুবাদ বাংলভায়ায় প্রকাশ করেছিলেন সত্যেন্দ্র নাথ বসু। ' *সত্যের স্বরূপ*' , সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলিকাতা, ১৩৮৭ (বাংলা)

১২। The Religion of Man, Rabindranath Tagore, 1931

১৩। মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যারয়, ১৯৩৩

১৪। Tagore Einstein Dialogue, Modern Review, January, 1931 “The Indian Connection: Tagore and Gandhi” (Chapter 9), Einstein Lived Here, Professor Abraham Pais, Oxford University Press, 1944 The Religion of Man, 1931
১৫। Religion and Science, Albert Einstein, New York Times Magazine, November 9, 1931

অজয় রায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের পদার্থবিদ্যাবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক (অব:) ।